প্রবন্ধ

প্রাচীন মাইয়া সভ্যতার মহান পুরাণকথা

পোপোল্ বু

লাতিন আমেরিকার আপন ঐতিহ্য

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিস্টফার কলম্বাস (ক্রিস্তোবাল কোলোন : ১৪৫১-১৫০৬) আজ থেকে পাঁচশো বছরেরও আগে, ১৪৯২ সালে, প্রথমবার নূতন জগতে পদার্পণ করার আগে, মেহিকো থেকে পেরু অব্দি, উত্তর থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত, খ্রিস্ট জন্মেরও আগে থেকে তিন-তিনটে গরীয়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো; উত্তরে, মেহিকো অব্দি, ছিলো আস্‌তেক সভ্যতার বিপুল প্রসার, যেখানে আসতেকরা পিরামিড অব্দি বানিয়েছিলো– সম্ভবত মিশরেরও আগে কিংবা তার সমসাময়িক কালে; তার মেহিকোরই প্রান্ত থেকে, বিস্তীর্ণ মধ্য আমেরিকা জুড়ে গড়ে উঠেছিলো মাইয়া সভ্যতার ভিত্তি ও বিকাশ, তারপর পেরুকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছিলো ইনকাদের নিজস্ব জগৎ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, মাচুপিচুর গিরি চূড়ায় গ'ড়ে ওঠা মন্দিরের ভগ্নদশার মধ্যে পাবলো নেরুদা একদিন খুঁজে পেয়েছিলেন ইনকাদের মধ্যদিয়েই পুরো মহাদেশের কণ্ঠস্বর ও প্রতিধ্বনি। শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা অপহৃত হ'য়ে যাবার আগে, যেখানকার আদিবাসীরা খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তনেরও আগে তিন-তিনটে গরীয়ান সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলো, তাদের জংলি, বর্বর, সংস্কৃতিবিহীন ব'লে অভিহিত করার স্পর্ধা শুধু ছিলো কোন্‌কিস্তাজারদের অসভ্যতারই।

মাইয়ারা তাদের সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই তাদের পুরাণ, অতিকথা, কল্পকাহিনীর মধ্যে ধ'রে রেখেছিলো সৃষ্টিতত্ত্ব ও শুভাশুভের মঙ্গল অমঙ্গলের দ্বন্দ্বের কাহিনীও যেটা মুখ থেকে মুখে, যুগ থেকে যুগে, কথ্য সংস্কৃতির মধ্যেই রূপ নিয়ে নিচ্ছিলো, আর তারপর সেই কথ্যসংস্কৃতি লিখিত অতিকথায় পরিণত হয়ে যায়– পোপোল্ বু-তে।

পোপোল্ বু ঠিক গিলগামিশের মতো; মহাকাব্য, পুরাণ, আর অতিকথার মিশ্রিত ফসল; ঠিক যেমন বাইবেল-এ জোব-এর আখ্যান; ঠিক যেমন হোমারের ইলিয়াড। পোপোল্ বু-কে না-জানলে মাইয়াদের জানা যাবে না– আর জানা যাবে না এমনকী এখনকার লাতিন আমেরিকাকেও। তাই, লাতিন আমেরিকার নাড়ির কম্পন অনুভব করবার জন্যেই, পোপোল্ বু পড়ছি আমরা এখানে। আশ্চর্য, এতদিনও কেন যে বাংলায় পোপোল্ বু-কে পাওয়া যায়নি, সেটা হয়তো আমাদের অন্ধ-বধির ঔপনিবেশিক দশারই লক্ষণ।

বিশ্বভুবন সৃষ্টি হবার আগে, শান্তি আর স্তব্ধতাই ছিলো মহান দুই রাজা, যারা সবখানে রাজত্ব করতো। কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না, কিছুই ছিলো না সেখানে। বস্তুরা সব প্রাণের টানে তখনও একে-অন্যের কাছে এসে জোটেনি, জুড়ে যায়নি, পৃথিবীর মুখটাই ছিলো না-দেখা, অদৃশ্য। সেখানে ছিলো শুধু অচঞ্চল সমুদ্র, আর আকাশের এক বিশাল শুন্যতা। কোথাও কোনো মানুষ ছিলো না, কিংবা ছিলো না কোনো জীবজন্তু, ছিলো না কোনো পাখি কিংবা মাছ, কোনো কাঁকড়াও না। গাছপালা, নুড়িপাথর, গুহাগহ্বর, ঘাস, জঙ্গল– তখনও এর

http://www.ajkerkagoj.com/

কোনোকিছুরই অস্তিত্ব হয়নি। ছিলো না এমনকিছু যা গর্জাতে পারে কিংবা পাঁই-পাঁই ছুটতে পারে, ছিলো না কিছুই যা কেঁপে কেঁপে ওঠে কিংবা হাওয়ায় কেঁদে ককিয়ে ওঠে, চীৎকার করে। সব চ্যাপ্টা, সমতল, ফাঁকা, আর তারই মধ্যে শুধু ছিলো সমুদ্র, একা, নিশ্বাসহীন। ছিলো শুধু রাত্রি আর অন্ধকার, দাঁড়িয়ে থাকতো স্তব্ধতা।

এই অন্ধকারের মধ্যেই অপেক্ষা করেছিলেন স্রষ্টারা, খোদ সৃষ্টিকর্তা, তেপেয়ু, গুকুমাৎস্, পূর্বপুরুষ, অগ্রজনক। তাঁরা সবাই সেখানে ছিলেন, এই শূন্যতায়, এই বিশাল ফাঁকায়, লুকিয়েছিলেন সবুজ আর নীল পালকসজ্জার আড়ালে, সবাই একা-একা, আলো দিয়ে ঘেরা, তাঁরা সবাই ঠিক প্রজ্ঞার মতো। তাঁরাই ভেবে-ভেবে সৃষ্টি ক'রে ফেলতে পারেন কিছু, রচনা ক'রে নিতে পারেন মনে-মনে, ভাবনায় আর কিছুই-না-র মধ্য থেকে নিয়ে আসতে পারেন কোনো শিশু। আর লগ্ন এসে হাজির। সৃষ্টিকর্তারা সকলে অন্ধকারের মধ্যে গভীর মগ্ন হ'য়ে ছিলেন আলোচনায়। তাঁরা তর্কাতর্কি করলেন, উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় ভ'রে গেলেন; যা হবে, হ'তে চলেছে, সে জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তাঁরা। তাঁরা পরিকল্পনা করলেন গূঢ়জটিল ঘন ঝোপঝাড়ের জন্ম ও বৃদ্ধি; কেমন করে বস্তুরা হামাগুড়ি দেবে, লাফাবে, দৌড়ুবে; তাঁরা ভেবে ঠিক করলেন মানুষের জন্ম। তাঁরা ছক তৈরি করলেন গোটা সৃষ্টিরই, তার সূক্ষ্ম গভীর নকশা, প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে অবিশ্রাম আলোচনা ক'রে চললেন, যতক্ষণ না তাঁদের কথা আর ভাবনা-চিন্তা হ'য়ে উঠলো স্ফটিক স্বচ্ছ দানাদার কেলাসিত, আর কথা আর ভাবনা মিলেমিশে হ'য়ে গেলো একই জিনিস। সেখানে ছিলো গগনশোভা, আকাশের হৃদযন্ত্র, আর অন্ধকারের মধ্যেই পরিকল্পিত হ'লো সৃষ্টি, তৈরি হলো তার ছক, তৈরি হ'লো তার নকশা।

তাহলে শূন্যতাকে ভ'রে উঠতে দাও!– তাঁরা বললেন। জল ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে নিজকে বুনে নিয়ে যাক নিচের দিকে যাতে পৃথিবী তার মুখটিতে দেখাতে পারে! আলো তাহ'লে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাক সব শৈলশিরায়, আকাশ ভ'রে থাক ঊষার হলুদ আলোয়! আমাদের গৌরব-মহিমা হ'য়ে উঠুক এই দৃশ্য– একজন মানুষ হেঁটে চলেছে গাছাপালার মধ্য দিয়ে, পথে। 'পৃথিবী!' স্রষ্টারা চেঁচিয়ে ডাকলেন। শুধু একবারই ডাকলেন তাঁরা, আর অমনি– ওই যে, ওইখানে, এসে হাজির সেঃ কুয়াশার মধ্য থেকে, ধুলোর মেঘের মধ্য থেকে, পলকের মধ্যে এসে হাজির গিরিপাহাড়। শুধু এই একটিমাত্র কথাতেই সাইপ্রেস আর পাইন গাছের বনগুলো ছড়িয়ে দিলো তাদের অঙ্কুর, তাদের মুকুল; ছোটো-ছোটো স্রোতের ধারা ইচ্ছে মতো ছুটে-ছুটে চলতে শুরু করলো গোল-গোল টিলাপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। স্রষ্টারা তার সৌন্দর্য দেখে অপলক মুগ্ধ সমস্বরে চেঁচিয়ে বললেন তাঁরাঃ 'এ হবে এমন-এক সৃষ্টি যা অন্ধকারকে সাজিয়ে দেবে!'

স্রষ্টারা তারপর শুধোলেনঃ 'চিরকালই কি স্তব্ধতা রাজত্ব করে যাবে এই গাছপালাগুলোর তলায়?' হঠাৎ সেখানে এসে দেখা দিলে ঝোপঝাপ বনজঙ্গলের অভিভাবকেরা, ছোটো ছোটো সব জীবজন্তু, গিরিপাহাড়ের একরত্তি সব ভূতপ্রেত, হরিণ, পাখির ঝাঁক, হাগুয়ার, সাপখোপ, ঝোপঝাড়ের সব প্রহরী। তারপর স্রষ্টারা এই প্রাণীদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। 'তুমি, হরিণ, তুমি চারপায়ে হেঁটে বেড়াবে শ্যামলের মধ্যে, আর নদীর ঠিক

http://www.ajkerkagoj.com/

কাঁধটার ওপর মাঠে-ঘাটে ঘুমোবে, কিংবা গিয়ে ঘুমিয়ে নয়ানজুলিগুলোর চাকার তলায়। বন্ধুতা রেখো ঝোপঝাড় আর তৃণভূমির সঙ্গে, তবে কারু সঙ্গে ভাবভালোবাসার জন্যে চ'লে যেয়ো বনের গহনে। তোমরা, পাখিরা, তোমরা হাওয়ায় উড়ে চলো। যাও, গিয়ে বাসা বাঁধো গাছের ওপর, লতাকুঞ্জে, সেখানেই নীড় বানিয়ে থাকো, সেখানেই ভাবভালোবাসা কোরো, সঙ্গী তার সঙ্গীনির সঙ্গে, সঙ্গীনি তার সঙ্গীর সঙ্গে, আর হাওয়াকে ভরিয়ে দাও তোমাদের ছেলেমেয়েতে।' স্রষ্টারা তারপর প্রতিটি প্রাণীর সঙ্গে পর পর কথা বললেন, প্রত্যেকের জন্যে ঠিক ক'রে দিলেন যার-যার নিজের আস্তানা, আর পাখিরা আর পশুরা, সাপেরা আর হাগুয়ারেরা, সবাই চললো যে-যার আস্তানার খোঁজে– নীড়, বাসা, ডেরা, কিংবা খোপখাপ। তাদের যার-যার থাকার জায়গা যখন ঠিক হ'য়ে গেলো, আদি পিতারা তাদের বললেন কথা কইতে। 'ডুকরে ওঠো, গুঞ্জন তোলো, গলা ছেড়ে হাঁকো, গরগর করো, ঘেউ-ঘেউ করো, হিস-হিস করো, কিন্তু কথা বলো, নিজের ভাষায়।' স্রষ্টারা তাদের বললেন। 'সবাই কথা বলো যে যার নিজের ভাষায়। কথা বলো আমাদের সঙ্গে।' কিন্তু তাদের গলা থেকে কণ্ঠনালী থেকে, বেরিয়ে এলো তুমুল কোলাহল। 'না, না।' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন স্রষ্টারা। 'আমাদের নাম ধ'রে ডাকো, তোমাদের গলার স্বরে-স্বরে জাগিয়ে তোলো আমাদের নাম, উরাকান, চিপি-কাকুলা, রাসা-কাকুলা, আকাশের হৃদয়, পৃথিবীর হৃদযন্ত্র, স্রষ্টা, রচনাকার, আদি পিতা, তোমাদের স্তব, তোমাদের ধন্য-ধন্য ধ্বনি সব তুমুল বৃষ্টির মতো ঝ'রে পড়ুক।' কিন্তু পশুরা বা পাখিরা তো আর মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। শোর উঠলো শুধু নানান পর্দায়। তারা শুধু জানে খ্যাক-খ্যাক করতে, হিসহিস করতে, বক-বকম করতে, ডুকরে উঠতে। পাখিরা আর পশুরা কেউই একে-অন্যের ভাষা বুঝতে পারে না– এ যখন কিছু কয় ওর কানে তখন কোনো আওয়াজই পৌঁছোয় না, পরস্পরের কথা যেন তাদের বধির কানে গিয়ে পৌঁছায়, তারপর স্রষ্টাদের নামের কথা উঠলেই তারা বোবা হয়ে যায়, মুখ দিয়ে কোনো রা বেরোয় না, স্রষ্টাদের নামই বুঝি তারা জানে না। স্রষ্টারা যখন পুরো ব্যাপারটা সরেজমিন খুঁটিয়ে দেখলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন এই সমস্যাটার সুরাহা-সমাধানের জন্যে কিছু-একটা তাঁদের করা উচিত। তাঁরা আলাদা-আলাদা ক'রে কথা কইলেন হাগুয়ারের সঙ্গে, তুর্কি মোরগের সঙ্গে, আরো সব প্রাণীদের সঙ্গে, বললেন, 'আমরা আমাদের মত বদলেছি। তোমরা যেহেতু ঠিক ক'রে কথাই বলতে পারো না, তোমাদের সবাইকে তাই খতম ক'রে ফেলা হবে। তোমরা তোমাদের নিজের নিজের আস্তানা রেখে দিতে পারো, গাছের ওপর তোমাদের নীড়, নদীর ধারে তোমাদের ডেরা, ঝোপঝাড়ের মধ্যে তোমাদের বাসা, কিন্তু তোমরা যেহেতু আমাদের নাম ধরে ডেকে জয়ধ্বনি দিতে পারো না, আমরা সৃষ্টি করবো আরো অনেক বাধ্য, অনুগত, বশম্বদ প্রাণী, যারা তা পারবে। তোমাদের নিয়তি, তোমাদের ভবিতব্য সব বদলে গেছেঃ তোমাদের মাংস ছিঁড়ে– খুঁড়ে উপড়ে নেয়া হবে।' পৃথিবীর প্রাণীদের বলি দেয়া হ'লো তখন, তাদের বিসর্জনের লগ্ন এলো, ঠিক হ'লো তাদের বধ করা হবে, জবাই করা হবে, গলাকাটা হবে, আর তাদের খাওয়া হবে।

http://www.ajkerkagoj.com/

'আবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের! উষা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে– সকাল প্রায় হ'য়ে এলো।' এবং স্রষ্টারা আবার চেষ্টা করলেন, মানুষের গায়ের মাংস বানাবার জন্যে ব্যবহার করলেন কাদামাটি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা বুঝে গেলেন যে এতেও মোটেই কোনো সুধিবে হবে না, এরও ফল হবে ফোঁপরা, তার ভেতরে কোনো সারই থাকবে না। এ তো নরম তুলতুলে একটা জিনিস, এ তো গ'লেই যাবে। অনড়, গায়ে যদি জোর না থাকে, এ তো এমনকী ঘাড় ফিরিয়ে পেছনেও তাকাতে পারবে না। এর দৃষ্টি তো গড়িয়ে পড়ছে, ঝ'রে যাচ্ছে, এ তো কথা কয় কাদামাটির মন নিয়ে। এ তো গ'লে মিশে যাবে জলের সঙ্গে। স্রষ্টারা বুঝতে পারলেন এই প্রাণীদের যেন কিছুতেই কোনো সন্তান না-হয়, আর তাদের বিনাশ হ'লো তাদের সৃষ্টিরই মতো চটপট।

'কিন্তু আমরা তাহ'লে কী করি?' তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কে তবে আমাদের স্তব করবে, আমাদের পুজো করবে, আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, টিকে থাকতে সাহায্য করবে?' আবারও তাঁরা ঠিক করলেন দেবজ্ঞের কাছে যাবেন, সেই যাঁরা জানেন এবং বলেও দেন ভবিষ্যতে কী ঘটবে না-ঘটবে। সেই যে-গণৎকারেরা হ'লো দিন আর প্রভাতবেলার দিদা দাদামশাই। বুড়ো দাদামশাই পারেন ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পুঁতি বীন কড়াইশুঁটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বুড়ি দিদা তো স্বর্গের মেয়ে, পূজারণী আর মায়াবিনী। তাঁরা মরকতের মহাজনের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করলেন, সেই যিনি তৈরি করে দেন চমৎকার সব অলংকার, আর কাঠখোল কেটেকুটে বানিয়ে দেন ভাস্কর্য। স্রষ্টারা তাঁদের জিগেস করলেন, কী দিয়ে মানুষ বানাবেন, কাঠ কেটে? 'আপনারা কী বলেন?' তাঁরা জিগেস করলেন, 'কাষ্ঠনির্মিত মানুষজন কি আমাদের কখনও পুজো করবে? আপনাদের লাল পুঁতিগুলো ছড়িয়ে দেখুন তো, ঠিক ক'রে বলুন আমরা কি কোনো লম্বা কাঠের গায়ে তাদের চোখ মুখ খোদাই ক'রে মানুষকে বানাবো?'

ভাবী কথকেরা উবু হ'য়ে ব'সে মুঠো-মুঠো পুঁতি, বীন, ভুট্টার দানা ছড়িয়ে দিলেন। 'নিয়তি! ভাবীকাল! প্রাণীকল্পনা!' বুড়ো-বুড়ি চেঁচিয়ে ডাক দিলে। 'সব এক হ'য়ে জড়ো হও, পুঁতিরা জড়িয়ে ধরো তোমরা একজন আরেকজনকে, আমাদের সঙ্গে কথা বলো! বলো আমাদের, স্রষ্টারা কাঠের গায়ে খোদাই ক'রে দেবে কাউকে। বলো, কাঠ কেটে খোদাই ক'রে যে-মানুষ তৈরি করা হবে, সে কি স্তব করবে, পুজো অর্চনা করবে যখন আলো এসে পড়বে, তখন আমাদের শাঁস জোগাবে, পুষ্টি দেবে। শুঁটি, পুঁতি, দানা, নিয়তি, প্রাণী কল্পনা! জোট বেঁধে এসো, গ্রহণ করো তোমরা একে অন্যকে। গগনহৃদি, সত্য বলা হোক, বলা হোক মূল সত্যটা কী!' সবকিছু তখন থেমে গেলো। ভুট্টার দানা চুপচাপ শুয়ে রইলো তাদের সন্দেশ নিয়ে, ভাবী কথকেরা উবু হ'য়ে ব'সে রইলো এক চুলও না-ন'ড়ে। তারপরেই বুড়ো-বুড়িরা বললেঃ 'কাঠের মানুষের গলার স্বর প্রতিধ্বনি তুলে দেবে সারা পৃথিবীতেই।'

সঙ্গে সঙ্গে কাঠ খোদাই ক'রে মূর্তিগুলো বানিয়ে নেয়া হ'লো। তারা সব ছিপছিপে, একহারা, দেখতে ঠিক মানুষের মতো। তারা রান্না-বান্না করে, নদীতে গা ধোয় জিনিসপত্তর ধোয়, তারা বনেজঙ্গলে শিকার করতে বেরোয়– সঙ্গে থাকে তাদের শিকারি কুকুরেরা, তারা গাছ

http://www.ajkerkagoj.com/

কেটে জমি সাফ করে, যাতে ভুট্টার খেত হয়, তারা ভুট্টা রুইতে পারে। তাদের ছেলে হ'লো, মেয়ে হ'লো, আর অল্পদিনের মধ্যেই তারা ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর সবখানেই। কিন্তু কাঠের মানুষদের তবু ছিলো না আত্মা কিংবা মন-মনন, আর তারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো উদ্দেশ্যবিহীন লক্ষ্যহারা এলোমেলো। যখন তারা কথা কয়, তাদের মুখগুলো থাকে ফাঁকা, ভাবলেশহীন, তাদের হাত-পাগুলো সরু-সরু, রোগা দুর্বল, কাঠির মতো। রক্তের ফুল- কুসুম শোভা ছিলো না তাদের, ছিলো না রসকষ আর্দ্রতা, কোনো মাংসও না, শুধু শুকনো আর হলুদ, এখন আর তাদের মনেও নেই গগনহৃদিকে, আকাশের হৃদয়টাকে। আর যেহেতু যারা তাদের বানিয়েছিলো তাদের যত্নআত্তি দেখাশুনো করেছিলো, তারা তাদের চিন্তাতেই কখনও কোনো ঠাঁই পায়নি, তারা শেষটায় হ্রাস পেয়ে গিয়ে বদলে গেলো নিছকই কাঠকুটোয়। প্রথমে, গগনহৃদি কাঠের মানুষদের ওপর লেলিয়ে দিলেন এক জলের ঢল, এক প্রবল বন্যা, আকাশ থেকে ঝ'রে পড়লো মুষলধারে ভারি রজন, বিষম জতু। আকাশ থেকে ছোঁ মেরে নেমে এলো আগিলা, বাজপাখি, কোটর থেকে তাদের চোখ খুবলে নেবে ব'লে; রক্তচোষা বাদুড় পাখা ঝাপটে চ'লে এলো তাদের মুণ্ডগুলোর দখল নিতে; তেপির, সেই যাদের শুঁড় আছে, ক্ষুর আছে, আধাশুওর আধাগণ্ডার সেই তেপিররা এলো তাদের হাড়গোড় ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে তছনছ ক'রে দিতে; আর হাঙয়ার, সে তো সবসময়ই ঠায় ব'সে থাকে অপেক্ষায়, সেও তার সুযোগ নিলে। গগনহৃদির কথা মনেও রয়নি, আর পৃথিবীর মুখ কালো ক'রে নেমে এলো আঁধার, দিনরাত্রি মুষলধারে ঝ'রে পড়তে লাগলো কালো বৃষ্টি।

তখন সবকিছু বিদ্রোহে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো কাঠের মানুষদের বিরুদ্ধে। লাঠিসোটা, বাটি গামলা, ছোটো-বড়ো জীবজন্তু, সবকিছু। 'অ্যাদ্দিন তোমরা আমাদের খেয়েছো, এবার আমরা তোমাদের খাবো,' যেসব পাখিপাখালি কুকুর ছাগল রাখা ছিলো পরে কখনও তাদের খাওয়া হবে ব'লে, তারা এবার বললে।

জাঁতাকলের শানপাথর রেগে তিনটে হ'য়ে বললে: 'কী-যে যন্ত্রণা দিয়েছো তোমরা অ্যাদ্দিন। পেষো, পেষো, পিষে চুরমার করো, ভোর থেকে সন্ধে অব্দি, আমাদের মুখ শুধু পেষাইকলই হ'য়ে ছিলো, ভাঙো, চোরো, পেষো! এখন যখন তোমরা আর মানুষ নও, এখন আমাদের পালা এসেছে তোমাদের পিষে একেবারে চুরচুর ক'রে দেবার।'

শিকারি কুকুররা বললে: 'আমরা এতকাল তোমার জন্যে শিকার করেছি, তোমার বাড়ি পাহারা দিয়েছি, কিন্তু তুমি কি আমাদের কিছু খাইয়েছো, খেতে দিয়েছো? তুমি কি ভেবেছিলে বর্ষা-বাদলার সময় বাইরে-বাইরে থাকতেই আমাদের ভালো লাগে? খুব ব্যস্ত সমস্ত ছিলে তুমি নিজেকে নিয়ে, আর আমাদের শায়েস্তা করবার জন্যে। সব সময়েই হাতের কাছে একটা লাঠি খাড়া রাখতে, যদি আমরা কখনও দৈবাৎ তোমার খাবারদাবারের কাছে এসে হাজির হই! কেন তুমি তোমার ভবিষ্যতের কথা কখনও ভাবোনি? কিন্তু এখন বড্ড দেরি হ'য়ে গিয়েছে হে, কারণ লাঠিগুলো এখন থেকে থাকবে আমাদের দাঁতের ফাঁকে,

http://www.ajkerkagoj.com/

আমাদেরই কামড়ে-ধরা!’ কুকুররা ঝাঁপিয়ে পড়লো লাঠি-মানুষদের ওপর, পেড়ে ফেললো, তাদের মাটির আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে দিলে তাদের মুখ।

চাটু, তাওয়া, ছাঁকনি, থালা, বাটি, হাঁড়ি-পাতিল সব আদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবার। ওহ্, এতকাল তুমি আমাদের এত জ্বালিয়েছো, এত কষ্ট দিয়েছো যে তা আর কইবার বিষয় নয়! ঝুলকালিতে কালো হ’য়ে গিয়েছে আমাদের মুখ, আমাদের চোখ-মুখ সব ঝুলে ভ’রে গিয়েছে! রোজ তুমি আমাদের ছুঁড়ে ফেলতে আগুনে, যেন আমাদের কোনো জ্বালা-যন্ত্রণারই বোধ নেই। সেঁকো, ভাজো, পোড়াও, সেদ্ধ করো, আগুনে ঝলসাও! এবারে তুমি ওই একই জ্বলুনি টের পাবে, স্বাদ পাবে কাকে বলে আগুনে ঝলসে যাওয়া!’

কাঠের মানুষরা এক ফাঁদে প’ড়ে গিয়েছে। তাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো যে-সব কাঠের মানুষ, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো্ চকমকি পাথররা, আছড়ে পড়লো তাদের মুখে মাথায়। টুকরো হ’য়ে-যাওয়া, জ্বলতে থাকা, ঘা কতক খেয়ে কুঁকড়ে-যাওয়া, ছুটতে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়া, তবু ছুটে পালাবার চেষ্টায় হন্যে হ’য়ে উঠলো তারা, কোথায় গিয়ে আশ্রয় পায়, কোথায় গেলে তারা বাঁচাতে পারবে নিজেদের। কেউ বেয়ে-বেয়ে উঠে গেলো বাড়িঘরের ছাতে, কিন্তু বাড়িগুলো সারা গা মাথা কাঁপিয়ে তাদের গা থেকে আছড়ে ফেলে দিলে তাদের। যারা ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছিলো তাদের মুখের ওপর খপ ক’রে বন্ধ হ’য়ে গেলো গুহা-গহ্বরের হাঁ। আর কাঠের মানুষরা খতম হ’য়ে গেলো। শুধুমাত্র কয়েকজনই, আঁচড়ে-কামড়ে না-হক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মুখচোখ, পালিয়ে বাঁচলো জলের বল-মণ্ডলোর ঘা থেকে। আর শরীর চুরচুর ক’রে দেয়া সব মার-ধোলাই থেকে। তাদের বেশির ভাগই হ’য়ে গেলো বাঁদর।

পৃথিবীর বুকে আরো-একবার নেমে এলো শান্তি। মেঘের মধ্যে যেমন-একটা নিশ্চল ভাব। জীবজন্তুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, লক্ষ্যহারা, বনের পথে-পথে। আছে আকাশ, আছে পৃথিবীও, কিন্তু চন্দ্রসূর্যের মুখগুলো ঢাকা। কিন্তু এই প্রশান্তির মধ্যে, ছিলো এক মস্ত দানব শুকসপ্তক লম্বা ল্যাজওয়ালা টিয়াপাখি গোছের জীব এই শুক পাখি কিন্তু তৈরি হয়েছে সাত-সাতটি পাখিকে জুড়ে দিয়ে এই শুকসপ্তক তো আহ্লাদে সাতখানা, গর্বে তার বুক ফুলে উঠেছে। ‘আমিই চাঁদ, আমিই সূর্য। আমি হচ্ছি আলো, ঝলমলের রশ্মি!’ বড়াই করে সে বলতে লাগলো। ‘আমার মাইমা আমার জাঁক-ঝলমলের কোনো সীমাই নেই। আমার চোখগুলো সব উজ্জ্বল রুপোর, আমার দাঁতের পাটি দামি রত্নপাথরের। তারাই আকাশের মুখের মতো ঝলমল করে ওঠে। আমার ঝিলিক লাগা জৌলুশ ছেটানো নাকটাই চাঁদের মতো সুন্দর। যখন আমি আমার রুপোর মসনদটার সামনে দিয়ে হাঁটি, পৃথিবীর মুখ আলো হ’য়ে ওঠে। আমার মানুষগোলামদের কাছে আমিই হলুম গিয়ে চাঁদ সূর্য!’ কিন্তু শুকসপ্তক তো আর সত্যি সূর্য নয়, সে তো শুধু অহঙ্কার, সে তো শুধু আত্মপ্রেম– নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে পালকে আর ধনরত্নে। সে শুধু দিগন্তই দেখতে পায়। এই বিশাল জগৎটা তার চোখে প’ড়ে না। এ হ’লো তখনকার কথা, যখন চাঁদ তারার মুখগুলো ঢাকা প’ড়ে ছিলো, আর সেই জন্যেই শুকসপ্তকের এত জাঁক, এত দেমাক। সত্যিকার মহিমা বা জৌলুশ কাকে বলে, সেটুকু কল্পনা করার

http://www.ajkerkagoj.com/

ক্ষমতাও তার ছিলো না– সে শুধু চাচ্ছিলো নিজের ঢাক নিজেই বাজাতে, চাচ্ছিলো অন্যদের ওপর তার কর্তৃত্ব ফলাতে, দাবড়ানি দিয়ে তাদের সামলে রাখতে, অধীনে রাখতে। কিন্তু তার রাজত্বকাল হ'লো খুবই স্বল্পস্থায়ী, প্রায় তাৎক্ষণিক।

দানবের পতন ঘটিয়েছিলো দুই ভাই, দুই যমজ ভাই, উনাফু আর এস্‌লান্‌কে। তারা ছিলো মায়াবী, দেবতা। যখন তারা শুনতে পেলে দানব চারপাশে কী দুঃখ-দুর্দশা ছড়িয়ে দিয়েছে,– আর কী-যে লজ্জার কথা!– সব কি না গগনহৃদির চোখের সামনেই। এই যমজ ভাইয়েরা ঠিক করলে তার এইসব অনাচার অবিচারের যোগ্য মাশুল দিতে হবে। 'যা হওয়া উচিত, এ কিন্তু মোটেই তা নয়,' তারা বললে। 'ধনের গর্বে একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেছে লোকটা। কী তার দেমাক, তার সবুজ পান্না আর রুপোরজতের জন্যে জাঁকের তার শেষ নেই, তার ওপর ওইসব হিরে জহরৎ মণিমরকৎ। আমরা এই অহংকারীর সিংহাসন উলটে দেবো, মসনদ থেকে টেনে নামাবো ওকে, আর যে-লোকই কখনও তার ধন গরিমা আর ক্ষমতাদর্পে সর্বেসর্বা হ'য়ে পড়তে চাইবে, তারই এই দশা হবে, তারই কপালে লেখা আছে নিয়তির এই বিধান।'

শুকসপ্তকের ছিলো এক বউ আর দুই ছেলে, আর এই যমজ বীরেরা জানতো যে এদেরও যথাযথ ব্যবস্থা করা উচিত। বড়ো ছেলের নাম সিপাক্‌না, সেই যে জন ঊষার আগেই সৃষ্টি করেছিলো গিরিপাহাড় আর তাদের সঙ্গে দারুণ মাখামাখি ছিলো তার। তার ভাই হ'লো কাব্রাকান, ভূমিকম্প, সেই যে জন গিরিপাহাড় ঝাঁকিয়ে নড়িয়ে দিতে পারতো। ছোটো-বড়ো সব গিরি-পাহাড়কেই থরথর ক'রে কাঁপিয়ে দিতো। দুই ছেলেই ছিলো তাদের বাপের মতো, শুকসপ্তক বললে, শোনো, শোনো সবাই, আমিই সূর্য।' তার ছেলে সিপাক্‌না বললে: 'আমিই বানিয়েছি ধরাতল।' তার অন্য ছেলে, কাবাকান, বললে: 'আমি ঝাঁকিয়ে দিই আকাশ, আর ধরাতলে আনি থরহরিকম্পন!' বাপ যে-রকম নিজের গরিমা আর মহিমাতে মশগুল হ'য়ে থাকতো, বাপকা ব্যাটা ছেলেরাও তেমনি গায়ে প'রে নিয়েছিলো গরিমাভূষণ মহিমাবেশ। তাদের হাবভাব চালচলন, আচার ব্যবহার সব ছিলো দুই ভাইয়ের কাছে পাপের বোঝা, অমঙ্গলের ডালি; তারা ঠিক করলে এদের একেবারে ধ্বংস ক'রে দিতে হবে, ধ্বংস আর নির্বংশ! শুকসপ্তক ভালোবাসতো মিষ্টি মধুর নান্‌ৎসে গাছের ফলমূল। তার ছিলো বিশেষ প্রিয় এক মস্ত গাছ, আর রোজ, প্রত্যেকদিন, সে তার বাড়ি থেকে সেখানে পায়দলে চ'লে যেতো, গাছ বেয়ে উঠে যেতো একেবারে ডগায়, আর সবচেয়ে উঁচু ডালপালায় ব'সে ব'সে খেতো মিষ্টি মধুর নান্‌ৎসে চেরি। উনাফু আর এসলানকে এ কথা জানতো। তারা সেখানে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে অপেক্ষা করতে রাগলো, আর ঠিক যখন দানব খেতে শুরু করছে, তারা খুব মনোযোগ দিয়ে তাগ করতে লাগলো তাদের ফুৎকার বন্দুক, সেই যে নল চেটায় জোরে ফুঁ দিয়ে লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে মারে তীক্ষ্ণাগ্র কোনো তীর, আর সোজা তারদিকে চালিয়ে দিলো তীর। ঠিক চোয়ালে গিয়ে ঘা লাগলো, দানব গাছের মগডাল থেকে আছড়ে পড়লো ভুঁয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আর্তনাদ করতে-করতে। উনাফু চট করে ছুটে গেলো তার দিকে, যেখানে গাছতলায় প'ড়ে প'ড়ে সে গোঙাচ্ছে তখন, কিন্তু তবু তার সঙ্গে গায়ের

জোরে সে চ'টে উঠতে পারলে তো! দানব তার ছেলের হাতটা ধ'রে এক হ্যাঁচকা টানে সেটাকে তার কাঁধ থেকে উপড়ে আনলে। উনাফু যন্ত্রণায় ডুকরে উঠলো, আর এস্‌লান্‌কে তার আর্তনাদ শুনে এলো তার সাহায্যে, তাকে উদ্ধার করতে। ছোকরা দেবতারা তখন দানবের নাগাল থেকে নিজেদের সরিয়ে ফেলেছে। তারা শুকসপ্তককে উনাফুর হাতটাকে নিয়ে টলতে টলতে বাড়ির দিকে যেতে দিলে। দানব তো বাড়ি এসে পৌঁছুলো, চোয়ালটায় দারুণ ব্যথা করছে। দরজা দিয়ে তাকে ঢুকতে দেখেই তার বউ আঁৎকে উঠে জিজ্ঞেস করলেঃ 'কী হয়েছে, স্বামিন্?

'কী হয়েছে ব'লে মনে হয়?' উত্তরে বললে দানব।' ওই দুই খুদে শয়তান ওদের ফুৎকার-বন্দুক ছুঁড়ে আমার চোয়ালটাকেই বেশামাল নাড়িয়ে দিয়েছে। দাঁতের ব্যথায় গেলুম।' সে হাতটা নিয়ে গিয়ে চুলি-র ওপরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে। 'ওই শয়তানটা এক্ষুনি এখানে ওর হারানো হাতের খোঁজে এসে হাজির হবে!' স্ত্রীকে সে জানালে।

উনাফু আর এস্‌লান্‌কে এবার ঠিক করলে তারা তাদের রণকৌশল পুরোপুরি পালটে ফেলবে। কাছেই একটা বাড়িতে থাকতো এক দীনহীন কাঙাল দম্পতি, তাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। অনেক দেখেছে, অনেক জানে; তারা দুজনে সটান ওই বৃদ্ধ দম্পতির বাড়ি চ'লে গেলো। বুড়োর মাথাটা একেবারে বরফশাদা– যাকে বলে তুষারশুভ্র, আরে সময়ের ভারে বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই কোমড় থেকে বেঁকে নুয়ে গিয়েছে। ছোকরা দুটি ব্যাখ্যা না ক'রে বললে তারা এসেছে মদত চাইতে, একটু যদি সাহায্য পায়। তারা অনুনয় ক'রে বললে,: 'আমাদের সঙ্গে শুকসপ্তকের বাড়ি চলো। তাকে তোমরা বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বলতে পারবে যে আমরা আসলে তোমাদেরই নাতি, আমরা তোমার সঙ্গেই এখানে থাকি, আর তোমার সঙ্গেই এ বেলা ও-বেলা বেরিয়ে যাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে চাইতে, কারণ আমাদের মা-বাবা তো কবেই মরে গিয়েছেন। তোমরা তাকে চুটিয়ে বলতে পারবে দাঁতের পোকা বার ক'রে দিয়ে দাঁতের ব্যথা আর ব্যামো কী ক'রে সারাতে হয় তোমরা তা জানো।' দুজনের কাকুতি-মিনতি শুনে বুড়োবুড়ি রাজি হ'য়ে গেলো, আর ছোকরারা তাদেরই পেছন পেছন গেলো দানবের বাড়িতে।

তারা গিয়ে দ্যাখে, শুকসপ্তক মসনদে ব'সে আছে। হাতে ধ'রে আছে চোয়াল। 'কী গো, দাদু-দিদি, আসা হচ্ছে কোত্থেকে?' সে বুড়ো বুড়িকে জিগেস করলে। 'ওই দুই ছোঁড়া কি তোমাদেরই ছেলে নাকি?'

'আমরা এসেছি ভুখানগর থেকে, হুজুর' বুড়ো-বুড়ি বললে, 'আর এই বেচারি অপগণ্ড হচ্ছে আমাদেরই নাতি, আর ভিক্ষে-টিক্কে যা-ই পাই আমরা এদেরই সঙ্গে তা ভাগাভাগি ক'রে নেই। আমরা দাঁতের পোকা বার ক'রে দিতে পারি, চোখের নজর ফিরিয়ে দিতে পারি, ভাঙা হাড় জায়গা মতোন জুড়ে দিতে পারি।'

'তাহ'লে আমার কপালে দেখছি এখনও একটু-আধটু ভালো তলানিতে প'ড়ে আছে! দানব উৎফুল- হয় বলে উঠলো, 'শুনে রাখো বাপু। দিনরাত এই দাঁতের ব্যথায় আমি মরছি। এই দাঁত আর চোখের জ্বালায় শান্ত হ'য়ে যে একটু ঘুমুবো তারই বা জো কী! সব আমারই

নিজের দোষে, ভালো ক'রে খেয়াল করিনি, সেই ফাঁকে দু-দুটো দানব আমায় কিনা তাদের ফুৎকার-বন্দুক ছুঁড়ে একেবারে ঘায়েল ক'রে দিয়েছে। খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না, কিছুই করতে পারি না। একটু দয়া করো আমায়, দোহাই। আমায় সারিয়ে দাও।'

'তোমার দাঁতে বিষম পোকা হয়েছে দেখছি,' বুড়ো বললে। 'ওই অত কষ্ট– সব বাপু সেরে যাবে দাঁত কটা উপড়ে ফেললেই, সেগুলো উপড়ে নিয়ে তারপর না-হয় তার জায়গায় অন্য দাঁত বসিয়ে দেবো।'

'কিন্তু আমার যে দাঁতেই সব মহিমা! আমি যে রাজা হ'য়ে বসেছি, সে তো এই দাঁতেরই দৌলতে। আমার দাঁত আর আমার চোখ– এরাই আমার অলংকার। তুমি আর যা-খুশি করো, কিন্তু দোহাই, ওই দাঁতগুলো তুলে ফেলো না!'

'কিস্‌সু ভেবো না,' অভয় দিয়েই বললে বুড়ো-বুড়ি। 'আমরা ওই খ'য়ে যাওয়া পোকায় কাটা দাঁতের বদলে ওখানে বসিয়ে দেবো হাড়ের তৈরি আনকোরা দাঁত। তোমাকে আগের মতোই তখনও দারুণ অভিজাত দেখাবে।' কিন্তু দাঁতগুলো উপড়ে ফেলার পর তাদের জায়গায় হাড়ের তৈরি দাঁত বসিয়ে দেবার বদলে, তারা বসিয়ে দিলে শাদা ভুট্টার দানা। রাজার মুখটা তো তক্ষুনি একেবারে ঝুলে পড়লো, তার গাল দুটো কেমন চিমশে গিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো, আর নাকটা রইলো ক্ষুরের ফলার মতো ধারালো। তারপর তারা এক-এক ক'রে সব কটা মুক্তোর মতো দাঁত তুলে ফেললে। শেষটায় তারা এমনকী দানবের চোখ দুটোরও চিকিৎসা করলে, চোখের তারা দুটো ফুঁড়ে দিলে। এভাবেই তারা তার যা-কিছু সম্পদ, যা-কিছু ঐশ্বর্য ছিলো, সব কেড়ে নিলে। এরপর থেকে দানব এমনকী কিছুই আর টের পেলে না। সে শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, অ্যাদ্দিন ধ'রে যেসব জিনিসের জন্যে তার এত জাঁক, এত দেমাক ছিলো, সব কেমন ক'রে লুট হ'য়ে গেলো। বদ্যিরা নিয়ে নিলে তার হিরেজহরৎ মণিমরকৎ– সবকিছু– যা কিছু ছিলো তার পার্থিব গৌরব। শেষটায় শুকসপ্তক ম'রেই গেলো, আর সেই দুঃখে তার বউ চিমালমাৎও কাঁদতে-কাঁদতে ম'রে গেলো। ওই বুড়োবুড়ি, যারাসব ভোজবাজি জানে, নানারকম তুকতাক ঝাড়ফুঁকে ওস্তাদ, তারপর চ'লে গেলো আগুনের কুণ্ডটার কাছে, আলাদা হ'য়ে যাওয়া হাতটা এনে তারা উনাফুকে সেটা ফিরিয়ে দিলে। জায়গামতো ব'সে যাবার পর হাতটা কী আশ্চর্য। দিব্যি আগের মতোই কাজ কারবার চালিয়ে যেতে লাগলো। আর, গগনহৃদির সব হুকুম তামিল ক'রে নেবার পর, এবার এই দুই ছোকরা অন্যসব কাজে হাত দিলো।

শুকসপ্তকের বড়ো ছেলে হ'লো সিপাক্‌না। একদিন সে যখন নদীতে নাইছে তখন, নদীর তীর দিয়ে চার-চারশো অল্প বয়সি ছেলে চ'লে গেলো–'হেঁইয়ো জোয়ান' ব'লে বিশাল একটা চ্যালাকাঠ টানতে টানতে, সেটাকে তারা তাদের বাড়ির এড়ো কাঠ হিশেবে ব্যবহার করবে ব'লে, যাতে বাড়িটা মজবুত হ'তে পারে। অনেক কুঁথিয়ে, কেঁদে, ককিয়ে, কষ্ট ক'রে তারা আস্তে-আস্তে নদীর পাড় ধ'রে চ'লে যাচ্ছে। সিপাক্‌না দেখতে পেলে তাদের গায়ের পেশীগুলো সব কেমন যেন কাঁপছে; দেখে সে জল ছেড়ে উঠে এসে বললে: 'শোনো খোকারা, আমাকেই বরং তোমাদের সাহায্য করতে দাও।' সিপাক্‌না সহজেই কাঠটা তুলে

http://www.ajkerkagoj.com/

নিলে, কাঁধে ক'রে সেটা ব'য়ে নিয়ে গেলো, যেখানে ওই চারশো জনে তাদের বাড়ি বানাচ্ছিলো।

কাঠটা মাটিতে নামিয়ে সে যেই চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, অমনি ওই চারশো ছেলে তার পথ আটকালে। জিগেস করলে: 'তোমার কি মা-বাবা আছেন?

'না মাও নেই, বাবাও নেই।'

'তাহ'লে তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই থেকে যাও না?' চারশো ছোকরা সমস্বরে জিগেস করলে দানবকে। 'আমরা তোমাকে চাকর রাখবো, আমাদের সব কাজকর্ম করবে তুমি, আর তার বদলে আমরা তোমার দেখাশুনো করবো। কাল গিয়ে তুমি আরেকটা কাঠ কেটে আনতে পারো, সেটা এখানে নিয়ে এলে বাড়িটার কড়ি-বরগার সমস্যার একটা সুরাহাও হবে। তোমাকে দেকে মনে হচ্ছে তুমি গোবেচারা ভালো মানুষ। তোমাকে আমাদের মধ্যে পেলে আমরা খুবই খুশি হবো।' কিন্তু জনান্তিকে, আড়ালে, ওই চারশো ছোকরা কিলকিল ক'রে নিজদেরই জিগেস করলে: 'কী ক'রে এই দানবটাকে মারতে পারা যায়?' সংখ্যায় তারা চারশোজন হ'লে কী হবে, তাদের সকলের তখন একটাই– একমাত্র ভাবনা– খুন করতে হবে একে। খতম! তারা আলোচনা ক'রে সবাই শেষে একটা প্রস্তাবে সায় দিলে: দানবটাকে তারা একটা কূপ খুঁড়তে বলবে, তারপর কাঠটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাবে সেখানে, তার নিজের কবরেই তাকে খুন ক'রে তাকে তারা গোর দেবে। কিন্তু এই চারশো ছোকরা যে তাকে খুন করবার মতলব আঁটছে, সিপাক্না সেটা বেশ ভালো করেই টের পেয়ে গিয়েছে, তাই ওই কূপটার মূল গর্তটা খোঁড়বার সময়। একপাশে ছোট্ট একটা খোঁদল তৈরি ক'রে রাখলে শিলা-কোটরের মতো, এমন-একটা কোটর যেখানে ঢুকে প'ড়ে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

'কতটা নিচে নেমেছো তুমি।' ছোকরারা হেঁকে জিজ্ঞেস করলে তাকে, কূপের পাশ থেকে।

'প্রায় পৌঁছে গিয়েছি তলায়' সিপাক্না উত্তর দিলে। ছেলেরা যেমন ফন্দি এঁটেছে, সেই মতো সে কিন্তু তখন নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে না, বরং এক পাশে একটা কোটর বানাচ্ছে যেখানে ঢুকে পড়ে সে প্রাণে বেঁচে যাবে। শেষটায় সে কূপটার তলা থেকে চেঁচিয়ে বললে : 'ঠিক হায়! কাজটা সারা হ'য়ে গেছে!'

ছোকরাগুলো তক্ষুনি কাঠটাকে গড়িয়ে দিলে কূপের মধ্যে, আর কানখাড়া করে হাতে মুখ ঢেকে শুনতে লাগলো কেমন নিঃশব্দে কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে নিচে। তারপর তারা শুনতে পেলে ধপ ক'রে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ, আর কূপের গহন গভীর থেকে তীব্র একটা আর্তনাদও উঠে এলো তক্ষুনি। খেটেছে! খেটেছে! ফন্দিটা খেটেছে!' চারশো জনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। 'কেল-া ফতে। আমরা ওকে খতম ক'রে ফেলেছি! ও যদি ওর কাজকর্ম ক'রেই চলতো, তবে আমাদের বেদম ভুগতে হতো। ওর গায়ে বড্ড জোর ছিলো, সাজোয়ান, পালোয়ান! এরই মধ্য সে আমাদের পথের কাঁটা হ'য়ে উঠছিলো। তবে এখন থেকে এই গর্তটার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে আমাদের সব সময়।' পরস্পরকে তারা বললে। 'অন্তত এটা ঠিকঠাক বোঝবার জন্যে যে ও সত্যি সত্যিই অক্কা পেয়েছে। যদি ও

http://www.aljerkagoj.com/

খতম হ'য়ে গিয়ে থাকবে, তবে সার বেঁধে আসবে পিঁপড়েরা। আমরা চিচা বানিয়ে নেবো এবার, আর তিন দিন তিন রাত্তির ভালোয়-ভালোয় যদি কেটে যায়, তবে আমরা আমাদের নতুন বাড়িটা বানানো উপলক্ষে এক আমোদ আহ্লাদ হুলে-াড়ের আয়োজন করাবো।'
তার ওই খোদলটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে ব'সে দানব সব কথাই নিজের কানে শুনতে পেলে। পরদিন লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে এসে হাজির, তারা ওই কাঠের গুঁড়িটার তলা দিয়ে অনবরত আসছে আর যাচ্ছে। ওই চারশো ছোকরাকে বোকা বানাবার জন্যে, সিপাক্না তার মাথায় কিছু চুল ছিঁড়লে, আঙুলের নখও কাটলে, তারপর দিয়ে দিলে সেগুলো পিঁপড়েদের, যাতে তারা সেগুলো ব'য়ে নিয়ে ওই অন্ধকূপ থেকে উঠে বেরিয়ে যায়। ছোকরাগুলো যখন দেখলে যে পিঁপড়েরা পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে চুল আর নখ ব'য়ে নিয়ে, তারা তো উল-াসে ফেটেই পড়লো। 'গেছে! হতচ্ছাড়া পিশাচটা গেছে! শয়তানটা অক্কা পেয়ে গেছে!' তারা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বললে। পরের দিন ছেলেগুলো তাদের ধুরন্ধর ফন্দির বিজয়োৎসব পালন করলে, এটা বিশ্বাস ক'রেই যে দানবটা ম'রে গিয়েছে। সে কী হৈ-হুলে-াড়ফূর্তি, সে কী হট্টগোল, নৃত্যদোল, বাড়িটা হাসিতে-হাসিতে যেন ঝমঝম ক'রে বেজে উঠছে। ছেলেগুলো তো ঢক-ঢক ক'রে গলায় শুধু চিচাই ঢালছে, চিচা পান করছে তো করছেই। টলোমেলো করছে পানোন্মত্ত, কেমন যেন জবুথবু অভিভূত হ'য়ে পড়ছে। তারা তো গলায় চিচা ঢেলেই বললো, যতক্ষণ-না এমন দশা হ'লো যে তাদের জ্ঞানগম্য আর রইলো না, কোথায় যে কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে আর কোনো হুঁশই তাদের নেই এমন বেশামাল বেহুঁশ তাদের হাল। আর তখন দানব বেরিয়ে এলো তার কূপ থেকে। বাড়িটা ধ'রে সে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিলে যে বাড়িটা হুড়মুড় ক'রে ছেলেগুলোর ওপরেই ধ্ব'সে পড়লো। ওই চারশোজন ছোকরার সব্বাই মারা গেলো– কেউ বাঁচতে পারেনি। তারা উঠে গেলো সোজা আকাশে, আর সেখানে গিয়ে একদল তারা হ'য়ে ফুটে রইলো। এই জ্বলজ্বলে তারার দলের নাম মোৎস।
উনাফু আর এস্‌লান্‌কে যখন শুনতে পেলে দানবটা তাদের বন্ধু ওই চারশো ছেলেকে বধ করেছে, তারা একেবারে যেন জাতাক্রোধেই ভ'রে গেলো। এদিকে দানবটার অভ্যেস ছিলো পাহাড়গুলোকে পিঠে ক'রে এ-জায়গা থেকে ও-জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সারারাত ধ'রে এই কাজটাই করতো সে; আর সে তার সারাটা দিন কাটাতো মাছ ধ'রে আর কাঁকড়াদের পাকড়ে। এই যমজরা খুব ভালোই জানতো যে দানবটা বিশেষভাবে কাঁকড়া খেতে ভালোবাসে, তাই তারা সোজা চ'লে গেলো নদীতে, আর মস্ত একটা পাতা নিয়ে একটা পাথরের ওপর এমনভাবে সাজিয়ে রাখলো যে দেখলে ঠিক হুবহু কাঁকড়া ব'লেই মনে হয়। অন্যসব পাতা দিয়ে তারা তৈরি করলে দাঁড়া আর নখর, আর এই ছদ্ম কর্কটককে তারা গিয়ে রেখে এলো মেয়াগুয়ান পাহাড়ের তলায় একটা গুহার গহন তলে। তারপর তারা বেরুলো দানবের খোঁজে, একটু গিয়েই দেখতে পেলে সে কাঁকড়ার খোঁজে নদীর ধার ধ'রে তন্নতন্ন ক'রে দেখতে দেখতে চলেছে– এ যে এমনটাই করবে, তা তো তারা জানতোই। 'এই-যে, ছোকরা,' তারা হেঁকে বললে: 'কী করছো তুমি ওখানে?'
'আমি আমার খাবারের খোঁজে বেরিয়েছি।'

http://www.allkeragoi.com/

'কেমনতর খাবার? কী খাবার?
'মাছ আর কাঁকড়া। কিন্তু গত দুদিনে আমি একটাও মাছ কিংবা কাঁকড়া ধরতে পারিনি। খিদেয় একেবারে ম'রেই যাবো বুঝি।'
'আমরা একটা মস্ত কাঁকড়াকে দেখেছি, এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।' যমজ ভাই দু'জন বললে। 'আমরা সেটাকে পাকড়াবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ওটা তার দাঁড়াগুলো দিয়ে আমাদের খাবলে-খুবলে-চিমটি কেটে এমনই নাজেহাল ক'রে দেয় যে শেষটায় আমরা হার মেনে চ'লে আসি। তবে তুমি হয়তো সেটাকে পাকড়াতে পারবে।'
'দোহাই,' দানব অনুনয় করলে। 'দোহাই তোমাদের আমার সঙ্গে চলো, গিয়ে দেখিয়ে দাও কোথায় সে আস্তানা গেড়েছে। পথে তোমরা ইচ্ছে মতো পাখি-টাখি শিকার করতে পারবে। কোথায় তাদের পাবে, আমিই তোমাদের দেখিয়ে দেবো।'
দানবের এই বিনীত গোবেচারা হাবভাব দেখে ভড়কিই খেয়ে গেলো দু-ভাই, তারা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো মেয়াগুয়ান পাহাড়ের দিকে। 'ওই-যে, ওখানে!' তারা গুহাটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে। 'তোমাকে অবশ্যি হামাগুড়ি দিয়ে এর ভেতরে যেতে হবে, যদি তুমি কাঁকড়াটাকে পাকড়াতে চাও। তবে সাবধান, ওটা যেন আবার তোমায় কামড়ে-টামড়ে আঁচড়ে-টাচড়ে না-দেয়– আমাদের তো একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রেই ছেড়েছিলো।'
'দেখে তো মনে হচ্ছে খেতে দারুণ সুস্বাদু হবে,' বললে দানব, 'এখুনি আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে।' চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো সে গুহার মুখটায়, তারপর খুব সাবধানে মাথাটা প্রথমে নামিয়ে দিলে গুহার মধ্যে, আর গড়িয়ে গেলো কাঁকড়াটার দিকে। যখন বাইরে থেকে শুধু তার পা দু'টিই দেখা যাচ্ছে, তখন ওই বিশাল পাহাড় আস্তে-আস্তে হড়কে এসে চেপে বসলো তার বুকটায়, অমনি ভোজবাজির ফলে– লাগ, ভেলকি লাগ!– দানবটা হ'য়ে গেলো এক মস্ত পাথর। সে আর কখনও ফিরে আসেনি।
তিন নম্বর উদ্ধত, হাম্বড়া, বদমেজাজি জন হ'লো কাব্‌রাকান, যে বলেছিলো: 'এই পাহাড়গুলোর দর্পচূর্ণ করবো আমি!'
গগনহৃদি এই চ্যাটাং বুলি শুনতে পেলে, চ'টে গিয়ে তারা ওই যমজ দু'ভাই উনাফু আর এস্‌লান্‌কেকে ডেকে বললে: 'এই দেমাক, এই হাম্বড়াভাব অসহ্য। ঠিক এমনভাবে তো পৃথিবীর কিছুই চলবার কথা নয়! কোনো রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে লোভ দেখিয়ে এই পিশাচটাকে সূর্য যেখানে ওঠে সেখানটায় নিয়ে যাও।' এই হুকুম পেয়েই দু'ভাই বুঝলো যে এই দশাসই কাব্‌রাকানও দোষ ক'রে ব'সে আছে, ঠিক যখন আগে দু'জন নিজেদের শক্তি, প্রতাপ আর, মহিমা নিয় আস্ফালন করেছিলো।
উত্তরে তারা জানালে: ঠিক আছে। কাজটা আমরা করবো। এটা তো সত্য যে তুমি আছো গগনহৃদি, যে-তুমি বিরাজ করো ঘরে স্থির শান্তি-সুখের মধ্যে!'
দু'ভাই গিয়ে দেখতে পেলে যে ওই দানবটি গায়ের জোরে পাহাড়গুলোকে ঝাঁকাচ্ছে। সে শুধু দাপাদাপি করছে, দু-পায়ে, আর পাহাড়গুলো ধ্ব'সে পড়ছে। 'বলি, চলেছো কোথায়, ছোকরা?' তারা তাকে জিগেস করলে।

http://www.ajerkagoj.com/

'কোথাও না, কাব্‌রাকান উত্তর দিলে। ও আমি শুধু পাহাড়গুলোকে একটু সজুত ক'রে দিচ্ছি। চিরকালের মতো সমতল জমির সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু, শুনি, তোমরা কে বাটক?'

'আমাদের কোনো নাম নেই,' দু-ভাই বললে জবাবে। 'আমরা নেহাৎই অপোগণ্ড দুই শিকারি– ফাঁদ পেতে কিংবা ফুৎকার বন্দুক ছুঁড়ে শিকার করি। আমাদের নিজের বলতে কিছুই নেই, আমরা শুধু টিলা-পাহাড়ের মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াই। তবে আজকেই আমরা একটা মস্ত পাহাড় দেখেছি, বিশাল উঁচু, তারই কথা তোমায় আমরা বলতে এসেছি। পাহাড়টা হু-ই ওই দিকে, আকাশটা যেখানে লাল হ'য়ে আছে তার ঠিক সামনেটায়, আর এটা এমনই বিশাল উঁচু যে এ অন্য পাহাড়গুলোর মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সবকিছু দ্যাখে। এই পাহাড়টা নিশ্চয়ই তুমি গুড়িয়ে সমতল ক'রে দিতে পারবে না– অন্তত আমাদের তো তা-ই মনে হয়।'

'কোথায়, কোথায় সেই হতচ্ছাড়া পাহাড়?' গ'র্জে উঠলো কাব্‌রাকান– দানব। 'রাস্তাটা দেখাও দেখি বাপু, আমি চট করে সেটাকে ধরণীতলে ফেলে শায়েস্তা ক'রে দিই।'

'তা তুমি চাইলে তোমায় পথটা দেখাবো বৈকি।' যমজরা বললে, 'আমরা না হয় পাখি শিকার করতে ওই পথেই যাবো।' তো অমনি তারা এগিয়ে গেলো সূর্যাস্তের দিকে। দ্যাখো তো এই দুই ভাইয়ের কাণ্ডকীর্তি দেখে যে– তারা তাদের ফুৎকার বন্দুকে শুধু জোরে-জোরে ফুঁ দেয়, আর অমনি আকাশ থেকে ধপ ক'রে প'ড়ে মরে পাখিগুলো। যখন তারা গাছের ডালপালা থেকে বেশ কয়েকটা পাখিকে গুলির ঘায়ে ঘায়েল ক'রে ফেলেছে, দু-ভাই থেমে প'ড়ে চট ক'রে কিছু কাঠকুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। পাখিগুলোকে ঝলসে সেঁকে দেবার আগে ক-টার গায়ে তারা শাদা চুনের একটা প্রলেপ বুলিয়ে নিলে; উদ্দেশ্য : এই দানোটাকে তারা মাটিতে ফেলবে ব'লেই চুনামাটি বেলেমাটি দেবে। পাখিগুলো আগুনের আঁচে ঝলসে গিয়ে হ'য়ে উঠলো সোনালি বাদামি, জলন্ত অঙ্গারের ওপর গলন্ত চর্বি ঝ'রে পড়লো ফোঁটায়-ফোঁটায় আর শোঁ-শোঁ শব্দ ক'রে তেতে পুড়ে গেলো।

পরবর্তী সংখ্যায় দেখুন

স্বর্গেও গান বাজনা হয়

- করিম শাহ

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মরমী সঙ্গীত বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের অনন্যসাধারণ ও যুগান্তকারী স্রষ্টা ও রূপকার হচ্ছেন লালন শাহ। বাঙালির আধ্যাত্মিক মানসজগত গঠন, চিন্তা-চেতনা ও মননকে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করেছে লালন শাহের গান। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের গণ্ডি পেরিয়ে এই গান আজ সার্বজনীন সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলার অনন্য সাধারণ মরমী কবি লালন শাহের গানকে যাঁরা জীবন্ত ও প্রবহমান করে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে কুষ্টিয়ার বাউল সঙ্গীত শিল্পী করিম শাহের নাম বিশেষভাবে

http://www.ajkerkagoj.com/

উলে-খযোগ্য। লালনের গানের একজন একনিষ্ঠ সাধক করিম শাহ ৮২ বছর বয়সেও একজন প্রাণবন্ত মানুষ। লালন শাহের গান, ঐতিহ্য, দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং লালন পরবর্তী ভক্ত ও সাধকদের পরম্পরা এবং গানের সৃষ্টিশীল ধারাকে যেসব সাধকশিল্পী বেগবান করেছেন তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, লালনের গানের বর্তমান অবস্থা, সুরের বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য লালন সঙ্গীতের মেধাবী ও সৃষ্টিশীল পুরুষ করিম শাহের সঙ্গে আলাপে জানতে পারি বাংলাদেশের এই প্রবীণ শিল্পী কুষ্টিয়া জেলার অঞ্জনগাছী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তারিখ তাঁর মনে নেই। পিতামাতা নাম রেখেছিলেন আবদুল করিম। পিতার নাম ঝুমুর আলী জোয়ারদার এবং মাতার কুসুম নেছা বিবি। ছোটবেলায় লেখাপড়া করতে পারেননি। "ছোটবেলায় ভীষণ দুষ্ট ছিলাম। খেলাধুলা, মারামারি করতাম। আস্তে আস্তে জ্ঞান বিবেক হতে লাগল। আমার বাবা বাউল গান করতেন। সে সময় পাল-া দিয়ে গান হতো। এসব গানকে বরিশাল, ফরিদপুর 'কড়চা,' কুষ্টিয়ায় 'শব্দ গান,' এবং যশোরে 'ভাবগান' বলা হতো। দেহতত্ত্ব, শরিয়ত, মারফত, নবুয়ত, বেলায়েত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পাল-াগান হতো। বাপ যখন গান করে বেড়াতো, তার সঙ্গে আমি 'জুরি' 'করতাল' বাজাতাম। বাজাতে বাজাতে আমার গানের নলেজ হয়ে যায়। আমার প্রথম ওস্তাদ আমার বাবা, দ্বিতীয় ওস্তাদ তছের ফকির (জগন্নাথপুর গ্রাম, দৌলতপুর), তৃতীয় ওস্তাদ আবদুল মকছেদ (অঞ্জনগাছী) এবং চতুর্থ ওস্তাদ বেহাল শাহ। বাবার গানের খাতাপত্র আমি পাই। লেখাপড়া জানি না, ব-কলম মানুষ। মুহুরি দিয়া পড়াইতাম। ফয়জুদ্দিন মোল-া (নয়নপুর) গান পড়ে আমাকে শোনাত। আমি মুখস্থ করতাম। ডুগি, একতারা, বায়া, জুরি বাজিয়ে সুর করে শিখতাম। তখন হারমোনিয়াম খুব একটা ব্যবহার হতো না।

আমার ওস্তাদ বেহাল শাহের নিকট থেকে বাউল গানের সুর আয়ত্ত করি। আমার আর কোনো ওস্তাদের নিকট যেতে হয়নি। তিনি আমাকে পাল-ার ধারাগুলো, কৌশল শিখান। কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে, কীভাবে উত্তর দিতে হবে। কায়দা কৌশল শিখান। আমি নিজেও তাঁর সঙ্গে পাল-ায় অবতীর্ণ হয়েছি এবং এইভাবে অনেককিছু শিখেছি।

উনার রচিত একটি গান তিনি আমাকে প্রথম শিখান। আসরে বা মাহফিলে গিয়ে প্রথমে এই গানটি করতে উপদেশ দেন। গানটি দিয়ে দৈন্য (প্রার্থনা) করতে বলেন।

তোমা ভিন্ন আর কেউ নাই অন্য
আমি তোমায় সত্য জানি
কোথায় রইলে ফাতেমা জননী"

ওস্তাদ বেহাল সম্পর্কে বলেন, "আমার ওস্তাদ বেহাল শাহ ব্রিটিশ সময়ে ম্যাট্রিক পাস করেছেন। কোরান জানতেন। নিজের রচিত গান হাজার বারশ' হবে। তিনি মুখ দিয়ে যা বলেছেন আমি কানে শুনেছি; আর মুখস্থ করেছি। মুখ দিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে শিখে ফেলতাম। আমি নিজেও বুঝি না– সব ঐশ্বরিক দান। যে সুর দেখাই দিছে সেটিই প্র্যাকটিস করেছি। কোনো পরিবর্তন করিনি। খোদা বখশ-এর গুরু হচ্ছেন শুকচান শাহ। আমার গুরু নিমাই শাহ। এরা সবাই অমূল্য শাহের হাতে তৈরি। অমূল্য শাহের নিকট গান শিখেছেন

http://www.ajkerkagoj.com/

বেহাল শাহ, নিমাই শা, শুকচান শাহ, গহর শাহ, বিশারদ শাহ। ভাল ভাল গায়ক সবাই অমূল্য শাহের সৃষ্টি।

আমার বাউল পথের গুরু নিমাই শাহ। তাঁর নিকট থেকে বাউল পথের পরিচয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাই। সত্য পথে চলা, সত্যবাদী হওয়া বাউল ধর্মের আসল মূল লক্ষ্য। গুরুর রূপ বা 'বরজখ' ঠিক রাখা সাধ্য সাধনার মূল। 'বরজখ' হচ্ছে মুরশিদ বা গুরুর রূপ। এই রূপ ধ্যান করাই মূল শিক্ষা। সকাল, সন্ধ্যা, শুতে, বসতে গুরুর রূপ ধ্যান করাই মূল সাধনা। 'বরজখ' সাধনার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য তিনি লালনের একটি বিখ্যাত গান তুলে ধরেন।

জানগা বরজখ ভেদ
পড়ে বেলায়েত
অচীনকে চিনে লও
ঐ বরজখ ধরে
নবুয়ত সব অদেখা তপজপ
বেলায়েতে রূপ বর্তমান দেখ নজরে
বরজখে ঠিক না রয় যদি
ভুলায় তারে শয়তান গিধি
যদি চিনা যায় তার বিধি হয়
আরেক জনকে সত্য বিশ্বাস কইরে
বরজখে নাই যার নিহারা
আখেরে সাইজির রূপ চিনবে না তারা
নবী ছরোয়ার বলেছে বারংবার
জানা গেল তার হাদিস মাঝারে

এখানে সেখানেও বরজখ
কেমনে চিনি
অদেখারে না দেইখে কেমনে ধরি
তাই লালন ফকির কয়
তাতে আরেক ধাঁধা হয়
বস্তু বিনে শুধু নামে
পেট কই ভরে।"

বাউল সাধকের খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, "গুরুর মতে বাউল সাধকদের মাংস খাওয়া নিষেধ। মাছ খাওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছেন। ডিম খাওয়া বাউল পথে একেবারে নিষেধ। একটি ডিমের মধ্যে সব কিছু রয়েছে– পইখ-পাখনা, নাড়ি-ভুড়ি-পুরা কাঠামো। তাই ডিম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোনো কোনো সময় ডিম খাওয়া হয়ে যায়। সব সময় মেনে

http://www.ajkerkagoj.com/

চলতে পারি না। আমার মতে মাংস খাওয়া না গেলে মাছও খাওয়া যাবে না। সমাজে চলতে গেলে না খেয়ে চলা যায় না। ধর্ম হচ্ছে মনের ধর্ম। সমাজ হচ্ছে বাহ্যিক জগতের ব্যাপার।" মানুষ ছাড়া কিছু নেই। মানুষের মধ্যে আল-াহ বিরাজমান। এটিই বাউলদের মূল মতবাদ। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বুঝি– মানুষরূপে সবকিছু। এই প্রসঙ্গে তিনি লালনের বিখ্যাত গান উদ্ধৃত করেন।

দাই ঠেকে বলছেরে মন আল-াগনি
সুখের কালে তারে ভুলরে মনি
আগা কেটে হলি মুসলমান
মানুষে আনলেনি ঈমান
মানুষরূপে মরদুদ শয়তান
ঘরে ঘরে শুনি
ওবাহুয়া জাত তুফান এলে
দরুদ কালাম পড়ে সকলে
সেই তুফান কেটে গেলে
গাজীর গান বেড়াও শুনে
দুইষে বেড়াও জাইত ভালনা
আপন জাইতের খবর রাখনা
লালন বলে এমন দিন কানা
কভু দেখিনি।

'সবার ওপর মানুষ সত্য' প্রসঙ্গে তিনি লালনের আর একটি গান উলে-খ করেন।

কি কালাম পাঠালেন আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশের এক এক বাণী কয় খোদা পাঠায়
এক এক দেশের এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমনি
মানুষের রচনা জানি তাইতে ভিন্ন হয়
যদি একই আল-াহর হয় রচনা
তাতে ত ভিন্ন থাকে না
মানুষের সকল রচনা
লালন ফকির কয়।

লালন শাহের বিখ্যাত ভক্তগণ হচ্ছেন দুদ্দু শাহ, মনিরুদ্দী শাহ, ভোলাই শাহ, শীতল শাহ, বলাই শাহ, মানিক শাহ, বছির শাহ, পাঁচু শাহ। লালন শাহের বাণী লিখতেন মনিরুদ্দী শাহ ও মানিক শাহ। মনিরুদ্দী পণ্ডিত ও মানিক পণ্ডিত নামেও তাঁরা বিখ্যাত। মহতের মুখে শুনেছি লালন বাবাজী নেশা করতেন না। তিনি পান খেতেন বেশি। সন্ধ্যাবেলায় এক পন পানের খিলি তৈরি করে ছোট একটা আসন ঘরে দরজা আটকিয়ে থাকতেন। ভোরের টাইমে

http://www.ajkerkagoj.com/

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলতেন তোরা কোথা গেলি– এখন পোনা মাছের ঝাঁক যাবে। মনিরুদ্দী শাহ ও মানিক শাহ খাতাপত্র নিয়ে তার চারদিকে বসে যেতেন। গানের পাণ্ডুলিপি উনারা লিখতেন।

ভোলাই শাহ-এর ভক্ত হচ্ছেন কোকিল শাহ, গোলাম ইয়াছিন শাহ। কোকিল শাহ-এর ভক্ত হচ্ছেন আবদুর রব শাহ, সোরাব আলী শাহ। পাঁচু শাহ-এর ভক্ত হচ্ছেন অমূল্য শাহ। অমূল্য শাহ-এর ভক্ত হচ্ছেন নিমাই শাহ, বেহাল শাহ, শুকচান শাহ। নিমাই শাহ-এর ভক্ত হচ্ছেন করিম শাহ।

করিম শাহ প্রথমে চিশতীয়া তরিকায় মুরিদ হন সুফী মনসুর আলী আল চিশতীর নিকট। এরপর তিনি বাউল পথে আসেন। গান বাজনা তত্ত্ব বিষয়ে গভীরভাবে জানার জন্য তিনি নিমাই শাহ-এর নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র গান করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “তখন পাল-ার জগতে গান হইত বেশি। পাল-া বেশি পছন্দ করে মানুষ। কুষ্টিয়া, যশোরে বর্তমানেও পাল-াগান বেশ জনপ্রিয়। তখন টিকিট প্যান্ডেলে মালেক দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, রজ্জব দেওয়ান, হালিম বয়াতী, মহেন্দ্র গোসাই, ননীবালা, দলিলুদ্দীন বয়াতী, লাইলীর সঙ্গে গান করেছি। টিকিট কেটে মানুষ গান শুনতে যেতো। গানে গানে উত্তর দিতে হয়েছে। অর্থাৎ গানের পৃষ্ঠে গান। এটিকে প্রশ্ন-প্রবর্ত (উত্তর)-এর গানও বলা হয়। গানে যখন কুলায় না তখন কথার মাধ্যমে উত্তর দিতে হয়। গানটা যখন শিখেছি তখন গানের পৃষ্ঠে গান শিখেছি। মঞ্চে ঠিক এভাবেই কাজ করেছি। প্রশ্ন-প্রবর্ত হিসাব করে শিখেছি। জোড়ায় জোড়ায় শিখতে হয়েছে। লালনের গান এক দুই হাজার মুখস্ত আছে। সম্পূর্ণ গান দিয়ে কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় না। কথা দিয়ে কাটাতে হয়। হিন্দু মাহফিলে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে গান করেছি। হিন্দু শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, সনাতন বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। মুসলমান আসরে কোরান, হাদিস নিয়ে কথা বলেছি। গানের পৃষ্ঠে গান আছে। কথা প্রসঙ্গে কথায়ও অনেক কিছু বলা যায়। গ্রামবাসীরা বাউল গানের আয়োজন করে। পাকিস্তান আমলে বিশ/ত্রিশ টাকায় নাইট গান করেছি। তখন থেকে গাইতে গাইতে হাজার, বারশ’, পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত গান করেছি। দরবেশী সুরে গান গাই। যন্ত্রী চার পাঁচজন থাকে। যতকের আয় ততকের ব্যয়। সঞ্চয় করতে পারিনি। আনুষঙ্গিক ব্যয় অনেক বেশি। অতিথি মেহমান বাড়িতে আসে। বাউলের মূল দর্শন হচ্ছে সেবা।

সেবা আদ্য সেবা মূল
সেবাই রাখে জাত কূল।

লালনের গানের আদি অকৃত্রিম সুর পরিবর্তনের তিনি ঘোর বিরোধী। লালন শাহের গানের একটি ভাবরসে সমৃদ্ধ একটি স্বতন্ত্র সুর তাল লয় রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত: লালনের গানের সুর বাউল সুর, দরবেশী সুর। বর্তমানে অনেকে নকল করে ফেলেছে। ফরিদা পারভীন লালন শাহের মাপকাঠিকে অনেকটা লম্বা করে ফেলেছে। বাউল মানে পাগল। পাগল আল-ার পাগল, স্রষ্টার পাগল, বাউলের যন্ত্র একতারা, দোতারা,

http://www.ajkerkagoj.com/

বেহালা। বাবুয়ানা করে, ঢং ঢাং করে, হারমোনিয়াম তবলা এনে অন্য রকমভাবে রাজসিকভাবে কাজ করে ফরিদা গানকে জনপ্রিয় করেছে। এতে লালন শাহের সুরের গৌরব নষ্ট হয়ে গেছে। সুর পরিবর্তন করে তাঁকে অমান্য করা হলো। কিন্তু আমি লালনের সুরের রদবদল করি নাই। লালনের অরিজিনাল সুর বাতিল করতে চাই না। ওস্তাদের কাছে যা শিখেছি তা ধরে রাখতে চাই মৃত্যু পর্যন্ত। আত্মবিশ্বাসী ও সমাজসচেতন এই বর্ষিয়ান শিল্পী বলেন, আমি চইলা গেলে, এই অধম চইলা গেলে, একদম মুছে যাবে পুরাতন গোষ্ঠী। আমার নামটা মহিন শাহ উলে-খ করে গেছিলেন মৃত্যুর সময়। আমি বাউল গান শিখিয়েছি শিল্পকলা একাডেমীতে, প্রজেক্টে। মহিন শাহও বাউল গান শিখিয়েছেন এই প্রজেক্টে। পাঁচজন ছাত্র তৈরি করেছি।
আমার সাধারণ জ্ঞানে যা বুঝি বর্তমানে লালন শাহের আসল ধর্ম চলছে না। জগাখিচুড়ি চলছে সবকিছু। যোগ্য ভক্তের অভাব। দুই একজন দেখা যায়। লালনের গান প্রচারিত করেছেন বেলাল শাহ। কাকাগুরু শুকচান শাহও গান প্রচার করেছেন। এদের গুরু অমূল্য শাহ লালনের গান বেশি প্রচার করেছেন। উনার মতো এতবড় গুণী– কালোয়াত, বাদ্যবাজনা বাজানোয় অসাধারণ দক্ষ ছিলেন অমূল্য শাহ। ওরে সর্বনাশ! অমূল্য শাহ এই জগতের মানুষ না, উনি স্বর্গ বা উপগ্রহের লোক। স্বর্গেও গান বাজনা হয়। অমূল্য শাহ সেই স্বর্গের বাদক, দেব-দেবতা ফেইল হয়ে গেছে তার কাছে।
অবশেষে করিম শাহ বলেন, “লালন ফকিরের গানের মূল রহস্য হচ্ছে– লালন জাতির উর্ধ্বের লোক। হিন্দুর ভিতরেও না, মুসলমানের ভিতরেও না। সে মানুষের মধ্যে।”
করিম শাহ-এর সঙ্গে সংলাপের ভিত্তিতে নিবন্ধটি তৈরি করেছেন **শফিকুর রহমান চৌধুরী**

আমরা তাঁদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারি!
সেদিন বসেছিলাম অফিস ঘরে। একজন বয়স্কা মহিলা এসে নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন বাবাজি আমি করিম শাহের স্ত্রী। আমি তাঁকে বসতে বললাম। তিনি বসলেন। বললেন, করিম শাহ গুরুতর অসুস্থ, স্ট্রোক করে হাসপাতালে ছিলেন অনেক দিন। ভক্ত শুভার্থীরা সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন, এক পর্যায়ে টাকার অভাবে হাসপাতাল ছাড়তে হয়েছে।
তাঁর শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে যে ভাতা পাওয়া যেত তাও বন্ধ, বলুনতো বাবাজি আমরা বাঁচি কেমন করে?
করিম শাহের স্ত্রী আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামিয়ে দিলাম, বললাম মাগো আমি জানি এরপর আপনি আমাকে কষ্টের কী কী তালিকা দেবেন। এই দেখুন আমার পকেটে আছে আজ ৩০ টাকা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি এ থেকে ১৫ টাকা আপনাকে দিতে পারি। মহিলা কতক্ষণ কাঁদলেন। এরই মধ্যে কবি শামীম রেজা এসে হাজির।
আমি শামীমকে অনুরোধ করলাম বাংলাদেশের প্রবীণতম এই বাউল সাধককে নিয়ে তাঁর পাতায় কিছু একটা করার জন্য। শামীম বললেন তাতে কী লাভ? করিম শাহের তো এখন

http://www.ajkerkagoj.com/

অর্থ প্রয়োজন, তাঁকে নিয়ে লিখলে হয়তো তাঁর খ্যাতি বাড়বে কিন্তু অর্থতো আসবে না। শামীমের কথায় যুক্তি আছে। কারণ কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি কিংবা প্রভাবশালী আমলার কাছে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া তার যোগ্যতা এই মহিলার নেই। এটাই আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা।

মহিন শাহ মারা গেছেন। মহিন শাহকে নিয়ে বাংলা একাডেমী একাধিক বই বের করেছে, মারা যাওয়ার পর হয়তো করিম শাহ বা সাইদ বয়াতির ওপরও গবেষণা হবে। পিএইচডি হবে। আপাতত আমরা তাঁদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারি!

সরকার আমিন

সাক্ষাৎকার

বিপর্যয়ের ভয় আমার কাছে খুব উদ্দীপক বিষয়

ফেদরিকো ফেলিনি

ফেদরিকো ফেলিনির জন্ম ২০ জানুয়ারি ১৯২০ রিমিনি'তে। বাবা উরবানো ফেলিনি, পেশায় ছিলেন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। মা রোমের মেয়ে, ইদা বারবিয়ানি। দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যোগ দিয়েছিলেন পিয়েরিনো'র সার্কাসে– অসুস্থ একটা জেব্রাকে তখন দেখাশোনা করতে হতো তাঁকে। যুদ্ধের সময় পর্যটনী এক থিয়েটার দলের সঙ্গে প্রায় গোটা ইতালি ঘুরে বেড়িয়েছেন, ছোট-ছোট নকশা লিখেছেন ওদের জন্য। ইলাস্ট্রেটর ও অনুবাদক হিসেবে কমিকস নিয়ে সে সময় কাজ করেছেন। রেডিও নাটক লিখতেন। রেডিওর কাজের সূত্রেই জ্যুলিয়েত্তা মাসিনা'র সঙ্গে আলাপ, রোমে তাঁকে বিয়ে করলেন ৩০ অক্টোবর ১৯৪৩। দেশে আমেরিকান সৈন্য প্রবেশ করলে ফেলিনি 'মজার মুখ' নামে এক দোকান খুলে সৈন্যদের ব্যঙ্গছবি আর পোর্ট্রেট আঁকতেন। সেখানেই ১৯৪৫-এ রসেলিনি'র সঙ্গে দেখা, রোমা, চিত্তা আপেরতা'য় সহকারীর ভূমিকা।

১৯৪৮-এ রসেলিনির ইল 'মিরাকলো'য় লেখক চিত্র-নাট্যকার সহ-পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৯-এ রসেলিনি'র 'ফ্রানচেসকো,' 'গ্যিলারে দি দিও'র চিত্রনাট্যকার ও সহকারী।

১৯৫০ থেকে নিজেই পরিচালক হিসাবে ছবি তৈরি শুরু করেন। প্রথম ছবি 'লুচি দেলভারিয়েতা। অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে ১৯৫২ সালে 'লো শ্যেইকো বিয়াঙ্কো' (দ্য হোয়াইট শ্যেইক), ১৯৫৩ সালে 'ই ভিতেল-ানি, (দ্য লেঅ্যাবাউটস), ১৯৫৪এ 'লা স্ত্রাদা,' ১৯৫৫-এ 'ইল বিদোনে' (দ্য সুইন্ডালার্স), ১৯৫৭-তে 'লে নোত্তি দি কাবিরিয়া,' ১৯৫৯-এ 'লা দোলচে ভিতা,' ১৯৬১-এ 'লে তেনতাৎসিওনি দেল দত্তর আন্তনিও (দ্য টেম্পটেশন অফ ডক্টর আন্তনিও), ১৯৬২-এ 'এইট অ্যান্ড হাফ,' ১৯৬৫-এ 'জ্যুলিয়েত্তা দেলি স্পিরিতি,' ১৯৬৮-এ টিবি 'ড্যামিট', ১৯৬৯-এ 'ফেলিনি সাতিরিকন,' ১৯৭০-এ 'ই ক্লাউনস' (দ্য ক্লাউনস), ১৯৭১-এ 'রোমা,' ১৯৭৩-এ 'আমারকর্দ,' ১৯৭৬-এ 'ইল কাসানোভা দি ফেদেরিকো ফেলিনি' ১৯৭৯-এ 'প্রোভা দ'অর্কেস্ত্রা,' ১৯৮০ সালে 'লা চিত্তা দেলে দোন্নে'

http://www.amarboi.com/

(সিটি অফ উইমেন), ১৯৮৩ সালে ‘এ লা নাভে ভা’ (অ্যান্ড দ্য শিপ সেলস অন), ১৯৮৫ সালে ‘জিঞ্জার এ ফ্রেদ’ (জিঞ্জার অ্যান্ড ফ্রেড), ১৯৮৭ সালে ‘ইন্তারভিস্তা’ (ইন্টারভিউ), ১৯৯০ সালে ‘লা ভোচে দেল লুনা (ভয়েস অফ দ্য মুন)।

নিজের কর্মজীবন, মার্ক্স ব্রাদার্স আর কান্না নিয়ে আন্না মুৎসারেলি’র সঙ্গে কথা বলছেন ফেলিনি। ভাষান্তর করেছেন **দেবাশিষ হালদারও সন্দীপন ভট্টাচার্য।**

আন্না মুৎসারেলি সাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এ শীর্ষ বাছাই দশটি ছবির তালিকায় তুমি বলেছ যে তুমি সেখানে শুধু ‘জনপ্রিয়’ সব ছবিই নির্বাচন করেছ, কারণ তুমিও আসলে ঐ সংস্কৃতিরই লোক।

ফেদেরিকো ফেলিনি:সিনেমা শুধু মহৎ পরিচালকদেরই সম্পত্তি নয়– ওর আরও অংশগ্রাহক আছে এবং তারাও এর কুলচিহ্নের নির্দেশ দেয়। বিশ দশকের পরের সেই সব ছবির কথা আমি ভুলতে পারি না, যেসব ছবির প্রাথমিক প্রতীকই ছিল বিশেষ কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মুখ– সে সময়ে আমার কাছেও সিনেমা মানে ছিল তা-ই। এ ব্যাপারে গার্বো’র মনোহারিতায় কঠোর বিচারকের মতো কিছু একটা ছিল: যেন একটা সাবধানবাণী, একটা মুখোশ, অপলক কোনো চোখ, তির্যক প্রাণহীন একটা ভঙ্গি– যেন এখনই কাউকে দণ্ড দেওয়া হবে। ক্যাথলিক চার্চ-শাসিত ইতালিতে বিচারককে দেখে মুগ্ধ না-হওয়াটা অসম্ভব, এক্ষেত্রে আবার নারী-বিচারক– যেন অশরীরী দেবী আথেনা। সুতরাং সিনেমা মানে এই সব মুখের সান্নিধ্য–তার মধ্যে গার্বো রয়েছেন, তারপর চ্যাপলিন, অথবা দু’জনে এক সঙ্গে– গার্বো যাদুকরী, পিথিয়া; আর ভবঘুরে চার্লি, তরুণ বিদ্রোহী– উভয়ে মিলে সবচেয়ে বিরুদ্ধ দুই মনস্তত্ত্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। তারপর ছিল স্ট্যান আর ওলি– ঐ অকুণ্ঠ উদ্দেশ্যহীন হাসির জন্য তাদের কাছে আমরা কত কৃতজ্ঞ, চ্যাপলিনের মতো সেখানে কোনো আবেগ বা আদর্শের ব-্যাকমেল নেই। আর বলতে হয় মার্ক্স ব্রার্দাসের কথা। এই তো সেদিন রাতে, রান্নাঘর থেকে এক গ-াস জল নিতে এসে দেখি টেলিভিশনে ডাক স্যুপ দেখাচ্ছে। ব্যাস, বসে গেলাম দেখতে। তারপর দেখি রাত আড়াইটার সময়ও সেই একা-একা বসে আছি, হাসির চোটে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, ড্রেসিং গাউনের হাতা দিয়ে মুছছি। কী দেবপ্রতিম ভাঁড়, কী তাদের ছন্দ, কী ত্বরিতগতির সংলাপ, যেন ব্যালের সৌষ্ঠব– তিনজন দুর্দান্ত ক্লাউনকে অন্যদের খেলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে তাহলে দাঁড়াল: গার্বো, তার পাশে চ্যাপলিন, অন্যদিকে স্ট্যান আর ওলি, আর মার্ক্স ভাইয়েরা তাদের সকলকে ঘিরে অবিশ্রাম নাচছে।

মুৎসারেলি:ব্যঙ্গচিত্র যে তোমার এত ভালো লাগে, তোমার ছবিতে এত যে কার্টুনের মত সব চরিত্রের উপস্থিতি– সে নিয়ে কিছু বলো।

ফেলিনি: ফ্যাসিজম আর ক্যাথলিক চার্চ– নাসবন্দির এই দুই যমজ কর্মকর্তা– তাদের অধীনে, বুর্জোয়া শিক্ষার কালো ছায়ার মধ্যেও ইতালি যদি টিকে গিয়ে থাকে, তবে সে জন্য আমেরিকান সিনেমাকে ধন্যবাদ। মনের বিরাট পুষ্টি মিলত আমেরিকার সিনেমা থেকে। সে

http://www.ajkerkagoj.com/

এক অন্য জীবন। কিন্তু সিনেমারও আগে, আমেরিকার বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল তাদের কমিক স্ট্রিপের কারণে। কোরিয়ের দেই পিকোলি বলে একটা ইতালীয় কাগজ ঐসব ব্যাঙ্গচিত্রীদের ছবি ছাপতো– শুধু গ্রাফিক বোধের দিক থেকেই নয়, সাহিত্যের বিচারেও তারা ছিলেন বড় শিল্পী। কারণ আমেরিকার সাহিত্য মানে তো শুধু স্টেনবেক আর ফকনার নয়; জিগস অ্যান্ড ম্যাগি, হানস আর ফ্রিৎস কাটৎজেন জ্যামারও বটে– ইতালিতে এ সমস্ত চরিত্র খুব জনপ্রিয়। সেই সূত্রে আমেরিকার প্রতি আমাদের একটা কৃতজ্ঞতার অনুভূতি হয়, সময়ের সাংস্কৃতিক ব-্যাকগ্রাউন্ডকে সহ্য করার ক্ষেত্রে আমাদের যা সাহায্য করেছে।

মুৎসারেলি: সেটাই কি তোমায় ব্যঙ্গচিত্রী হওয়ার দিকে নিয়ে গেল?

ফেলিনি: ছোটবেলায় এসব ছবি আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কপি করেছি। সাদা জমি দেখলেই আমার আঁক কাটতে ইচ্ছে করে– ছবি করার সময়ও ঐ অভ্যেস আমি ছাড়তে পারিনি। আর যেহেতু মহৎ ক্লাসিকসের মতো আমার কোনো সিনেমাথেক স্মৃতি নেই, একটা ছবি আমার আঁকা স্কেচের মধ্যে দিয়েই আমার কাছে প্রথম হাজির হয়। তার ফলে পরিপ্রেক্ষিতের ওপর দখল জন্মায়; সেটের দূরত্ব, পোশাক, একটা চরিত্রের মুখ ঠিক কী রকম হওয়া উচিত– সেসব বোঝা যায়। নতুন কোনো ছবির প্রস্তুতি নিতে যখন শুরু করি, তখন আমার প্রথম পদক্ষেপই হয় গ্রাফিক। আমি যে কাজ করছি, গোটা ব্যাপারটা যে ঠিক রাস্তা ধরে চলছে, সে কথা নিজেকে বলার এটা একটা উপায়ও বটে। রোমে প্রথম-প্রথম আমি ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবেও কাজ করেছি, যাতে কিছুটা অভাব মেটে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে কারও ব্যঙ্গচিত্রের দরকার আছে কিনা, জানতে চাইতাম তখন।

মুৎসারেলি: লা দোলচে ভিতা আর এইট অ্যান্ড হাফ করার মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান– এ সময়ে, লোকে বলে, তুমি নাকি অভিব্যক্তির সংকটে ভুগছিলে?

ফেলিনি: অভিব্যক্তির সংকট আসুক– এই তো সব সময় চাই। ও ছাড়া চলবে কী করে?

মুৎসারেলি: এইট অ্যান্ড হাফ তাহলে এই সংকটের ফসল, যেন এ সময়ে এই একটাই ছবি তুমি করতে পারতে? ছবি তৈরি-করা নিয়ে ছবি করার ভাবনাটা কোথা থেকে পেলে?

ফেলিনি: পুরনো ছবির কথা মনে করা শক্ত, এমন কী তার .... যাই হোক কিছুদিন ধরে বিভিন্ন পরতে একজন লোকের প্রতিকৃতি বানানোর ভাবনাটা মাথায় ছিল– তার স্মৃতির পরত, কল্পনা, স্বপ্নের পরত, তার প্রতিদিনের জীবন ইত্যাদি নিয়ে এমন একটা চরিত্র, যার এখনও কোনো পেশাগত বা ব্যক্তিগত পরিচয় তৈরি হয়নি (প্রথম দিকে সে সিনেমা পরিচালক ছিল না)। একটি মাত্র দিনের বহুমাত্রিকতা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি সেখানে, কুণ্ডলীর মতো একটা সচেতন আর একা অচেতন জীবন খুলে যাচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই, মুক্ত কথন বা নিছক গালগপ্প করার জন্য সেখানে প-টের ধারণা বিসর্জন দিয়েছি। ভাবনাটা ছিল, সময়ের সেই বোধ পুনরুদ্ধার করা যেখানে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন স্মৃতি আর বাসনা– সব একাকার হয়ে যায়।

প্রকল্পটা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল, এতটাই যে সে আমি বলে উঠতে পারছি না। তারপর আমি শিয়ানচিয়ানোতো গেলাম, সে এক প্রস্রবণখ্যাত শহর, গেলাম সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য। আর ঐ

http://www.ajkerkagoj.com/

পরিবেশ-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গ-াস হাতে লাইনে দাঁড়ানো, প্রস্রবণের মহিমা– এই আনুষ্ঠানিকতায় যখন একদল লোক জড়ো হয়, সেখানে সব সময় একটা নারকীয় যন্ত্রণাভোগের বোধ কাজ করে, ব্যালের মতো– সেখান থেকে আমি ধ্যানের এই পশ্চাৎপটে পৌঁছলাম– নিজের দৈনিক ছন্দের মধ্যেই একটা লোক রুদ্ধ ও স্তব্ধ মুহূর্তের কবলে পড়ে গেছে, কারণ সেখানে একটা ত্রাস আছে, হয়তো একটা অসুখ।

কিন্তু আমার চরিত্রটিকে তখনো আমি চিনতাম না। আমি এক লেখকের কথা ভেবেছিলাম, কোনো উকিল বা সাংবাদিক: কিছুতেই মনোস্থির করতে পারছিলাম না, ফলে কোনো মুখ ছাড়া এই স্মৃতি, এই ধ্যান শূন্যে মিলিয়ে গেল। এইট অ্যান্ড হাফ-এর বোধহয় এটাই বড় শিক্ষা। একটা সময়ে নিজেকে বলেছি, 'এঞ্জিনটা ছেড়েই দাও, সবাইকে তুলে নাও, কেউ একজন যোগাবে, তোমাকে কাজ করতে জোর করার জন্য অন্য লোককে বাধ্য করো।' আমি তা-ই করি। সেট বানাতে শুরু করি, অভিনেতাদের সঙ্গে চুক্তি করি, আর ছবিটা শুরু হয়। প্রথমদিকে আমার হাতে কোনো স্ক্রিপট থাকে না, কয়েকটা চিরকুট, তুলি-ও পিনেলি- আর এন্নিও ফ্লাইয়ানোর সঙ্গে লেখা দু'একটা দৃশ্য, আর কী করতে চাই– এই নিয়ে আমার ক্লান্তিহীন, অন্তহীন বকবকানি। খমারবাড়ির দৃশ্যটা নির্মাণ করতে শুরু করি, দু'মাস নিবিড় পরিশ্রম করে বুঝি যে আমি কী চাই, আমি তা জানি না। প্রতিদিন স্টুডিয়োয় যাই, সারাদিন আমার অফিসে বসে থাকি, ছবি আঁকি, ফোন করি, কিন্তু ছবি তখন সেখানে নেই।

তারপর একদিন টাইপরাইটারে গিয়ে বসি, ছবির প্রযোজককে একটা চিঠি লিখতে শুরু করি– 'প্রিয় রিৎসলি, এ চিঠি সুন্দর একটা বন্ধুত্ব ছাড়াও হয়তো আমাদের পেশাগত সম্পর্কেও চিড় ধরাবে। আমি দুঃখিত, ছবিটি তৈরি করার ব্যাপারে তুমি হয়তো কথা দিয়ে ফেলেছ, কিন্তু আমি তোমাকে তা স্থগিত রাখতে বলছি।' চিঠিটা লিখছি, হঠাৎ শুনি নিচের তলায় সেট থেকে কেউ যেন আমাকে ডাকছে। বোচিও'র ষাট বছরের জন্মদিন উপলক্ষে নাকি একটা ছোট পার্টি হচ্ছে, তাতে যোগ দিতে ডাকছে গাসপারিনো। চিঠিটা রেখে আমি ওর নিচে নেমে আসি, ছোট-ছোট কাগজের গ-াসে বোচিও তখন পানীয় ঢালছে। আমি একটা গ-াস নিয়ে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই আর বোচিও হঠাৎ বলে ওঠে, 'এ ছবিটা দেখো চমৎকার হবে!' নিজেকে আমার বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয় তখন, যেন একজন ক্যাপ্টেন তার দলবল ছেড়ে পালাচ্ছে। বোচিওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওপরে যাওয়ার বদলে আমি বাগানে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসি। ভাবতে থাকি, 'হায় রে, আমি এমনই এক পরিচালক, কী করতে চায় তা-ই যার মনে নেই।' আর সেই মুহূর্তে ছবিটা তৈরি হয়ে যায়: এটাই আমি করব এমন এক পরিচালকের কাহিনী বলব যে তার নিজের ছবির কথাই বেমালুম ভুলে গেছে।'

কয়েকদিন পরে ফিল্ম ল্যাবরেটরিগুলো ধর্মঘট করে বসল। সকলেই বলল শুটিং বন্ধ করে দিতে, কেননা তখন আর রাশপ্রিন্ট পরীক্ষা করে দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি বললাম, 'না, আমরা কাজ করব।' কী করছি না– করছি, একবারের জন্যেও না-দেখে টানা চার মাস শুটিং করলাম– ব্যয়বহুল সব কাঠামো ভেঙে নতুন সেট বানালাম, যাদের ভূমিকা

http://www.ajkerkagoj.com/

শেষ হয়ে গিয়েছিল সেসব অভিনেতাদের বাদ দিলাম– আমার ক্যামেরাম্যান তো স্নায়ুর চাপে অসুস্থই হয়ে পড়ল। শুটিং শেষ হলে চার মাসের কাজ দেখার জন্য তিন দিন প্রোজেকশন রুমে কাটালাম। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা– এমন একজনের কাহিনী, যে কী করছে না– জেনেই একটা ছবি শুট করে গেছে।

ছবিটার জন্ম হয়েছে বন্ধনহীন মেজাজে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আস্থা আর অবাধ্যতার আবেগে– ছবিটার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, পরে তার এতটাই সাফল্য জোটে যে সেটা একটা বিশেষ ঘরানা বা মবহৎব হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে গেল। ওয়েস্টার্ন আর ডিটেকটিভ ছবির পাশাপাশি এইট অ্যান্ড হাফে'রও একটা ঘরানা তৈরি হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে যদি কিছু শিখে থাকি তা হলো এই যে, ছবি তৈরি করার সময় অসঙ্গত বা প্রতিকূল কোনো ঘটনা, অভাবিতচ্ছেদ বা ধর্মঘট– যা-ই ঘটুক না কেন, সব কিছুই আখেরে ছবির পুষ্টিতে লাগে।

মুৎসারেলি: ভয় পাওনি?

ফেলিনি: বিপর্যয়ের ভয় আমার কাছে খুব উদ্দীপক বিষয়। ধ্বংস, শেষের সেদিনের ত্রাস– এ সবের আমি খুব অনুরাগী, শেষকে দেখি নবসূচনার চিহ্ন হিসেবে। তা বলে আমি বিপর্যয় খুঁজে বেড়াই না, কিন্তু এ রকম সন্ত্রস্ত একটা আবহাওয়া আমার দরকার হয়।

আমার সৃষ্টিশীলতার গোপন কথা খুব সোজা– চুক্তিতে সই করি, আগাম কিছু টাকা নিই, জানি যে সে-টাকা আমি কোনোদিনই শোধ দেব না, জেলে যাওয়ার ভয় বা চূড়ান্ত বদনামের ভয়ই সে অর্থে আমার ছবি করার মূল প্রেরণা। রেনেসাঁ'র সময়কার শিল্পীদের সঙ্গে নিজেকে বেশ মেলাতে পারি আমি, ঐ যারা পোপ বা প্রিন্সের কাছ থেকে কাজের ফরমাশ নিত, তারপর তা না-করতে পারলে তাদের সোজা পাঠানো হতো জেলে, বা হয়তো তার চেয়েও ঢের খারাপ কিছু ঘটতো।

মুৎসারেলি: বক্স অফিসে প্রচুর টাকা পিটল, কিন্তু সমালোচকরা খুব একটা মুখ খুললো না– এমন ছবির প্রতি তোমার ঝোঁক বেশি, নাকি টাকার অঙ্কে ছবিটা কিছুই দিল না, কিন্তু সামলোচকরা প্রশংসায় ভাসিয়ে দিল– এমন ছবিই ভালো?

ফেলিনি: টাকা? ...ও নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। ও ব্যাপারে আমি একেবারে নিষ্পাপ বলছি না, টাকা নিয়ে আসলে আমি মাথাই ঘামাই না। ছবি করার সময় আমি তার ফলাফল নিয়ে ভাবি না– সমালোচকদের উৎসাহ নিয়ে না, বক্স-অফিসের রিটার্ন নিয়েও না– ছবি লোকে করে নিজের জন্য, কারণ চুক্তি আর আগাম টাকার অনুপুঙ্খটুকু বাদ দিলে ছবিটা তোমাকে করতেই হবে, তা-ই করা। অবশ্যই তৃপ্তি হয় যদি তা সবচেয়ে ধুরন্ধর সমালোচককেও খুশি করতে পারে, আবার দর্শকেরও মনোরঞ্জন করতে পারে। মনের গভীরে এরকম একটা লক্ষ্য নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু কাজ করার সময় ওসব সামনে আসে না। সে যা করতে চায়, তার মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে ভাবা ছাড়া এ পেশায় কেউ অন্য আর কিছু নিয়ে ভাবে বলে আমার মনে হয় না– ঐসব চরিত্র, ঐ পরিস্থিতি, অতীতের জন্য আর্তি, অনুশোচনা আর পূর্বানুমানের ঐ বিভ্রান্তিকর ভাবাবেগ, ঐ অসংজ্ঞাত আবহাওয়া, রঙ আর

http://www.ajkerkagoj.com/

চরিত্রে যা অক্সিজেনের মতো প্রাণসঞ্চার করে; স্বপ্নকে যে স্পর্শ করার মতো সুসংহত কোনো কিছুতে রূপান্তরিত করতে চায়– এই হলো তার একমাত্র উলে-খভূমি।

মুৎসারেলি: তুমি কি বলবে যে তোমার শেকড় আছে নিও-রিয়্যালিজমে?– পাইসা ও রোমা, চিত্তা আপেরতা'য় চিত্রনাট্যকার হিসেবে রসেলিনি'র সঙ্গে তোমার কাজ করার কথা ভাবছি আমি।

ফেলিনি: তথাকথিত নিও-রিয়্যালিস্টদের চেয়ে রসেলিনি আলাদা-আলাদা তাঁর দেখার গুণে, বলিষ্ঠ সহমর্মী সাক্ষী হিসেবে তাঁর সরাসরি ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ার গুণে– তিনি জানতেন কীভাবে বস্তুপুঞ্জের চারপাশের আলোবাতাস-সমেত ছবিটা তুলতে হবে। তাছাড়া চটকদার জমকালো জিনিস হিসেবে সিনেমাকে তিনি অপছন্দ করতেন– সেটাও একটা কারণ। উলে-খিত দু'টো ছবিতে আমি দর্শক হিসেবে অংশ নিয়েছিলাম এবং হয়তো সিনেমার প্রতি আমার বিশেষ মনোভাবের কিছুটা আমি শিখেছি রসোলিনি'র কাছ থেকেই। অবিশ্বাস্য সব বিভ্রান্তির মধ্যে তিনি কাজ করতেন– রোমাটিক জটিলতা, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি। নেপলসে তখন পাইসা'র শুটিং চলছে, রাস্তার মাঝখানে, আমাদের পেছনে মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে, স্পষ্ট মনে আছে আমার– মাথায় বেরেক্যাপ আর হাতে মেগাফোন নিয়ে তিনি কিন্তু অচঞ্চল: ঈশ্বরের মতো ক্যাজুয়াল, যিনি একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি করছেন, শুধু তার ছবি তুলবেন বলে। এই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা, যা নিও-রিয়্যালিজম আমায় শিখিয়েছে।

মুৎসারেলি: লা দোলচে ভিতা শুধু ইতালিতে নয়, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও তুমুল সাফল্য পেয়েছে। ছবিটা করার সময়ে আন্তর্জাতিক দর্শকের কথা কি তোমার মাথায় ছিল?

ফেলিনি: না, তা মনে হয় না– যদি ঐভাবে আমি ছবির পরিকল্পনা করতাম, তাহলে আমারকর্দ-এর মতো ছবি আমি বানাই কী করে? ফাটকাবাজি বাদ দিয়ে সনিষ্ঠ শুদ্ধতায় ছবিতে সাহিত্যে, সঙ্গীতে বা সিনেমায় কারো যদি নিজেকে অভিব্যক্ত করার তাগিদ থাকে, তাহলে ঐ সনিষ্ঠতা ও অভিব্যক্তিকতা ছাড়া আর কিছু কারো পক্ষে ভাবা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আমি চিরকাল যে-ছবি করতে চেয়েছি, তা-ই করেছি। মনে আছে ছোটবেলায় আমি জীবনে কী করতে চাই, তা জানতাম না। আমার ক্লাসের বন্ধুদের ধারণা এ বিষয়ে পরিষ্কার ছিল – কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ উকিল– কিন্তু আমি হতে চেয়েছিলাম ছবি-আঁকিয়ে, কার্টুনিস্ট, সাংবাদিক বা অভিনেতা। শেষ পর্যন্ত আমি এমন একটা পেশা বেছে নিলাম, যেখানে এ সমস্তই আছে। আমি যখন সেট-এ থাকি, তখন সেখানে ১০০ শতাংশ হাজির থাকি। আসলে আমি একটা পাগল– আমিই আমার ছবির কাঠের মিস্ত্রি, আমিই দর্জি, আমিই ইলেকট্রিসিয়ান। আমি নিজেই দেওয়ালে ছবি টাঙাই, আমি নিজেই মেক-আপ চড়াই বা মেক-আপের লোককে বলতে থাকি কীভাবে একটা মুখে অভিব্যক্তি আরও ছড়িয়ে দিতে হবে– যাতে তা আরও সরাসরি, আরও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

['ফেদেরিকো ফেলিনি, আত্মজৈবনিক রচনা বক্তৃতা সাক্ষাৎ' থেকে নেয়া হয়েছে]

গুচ্ছ কবিতা

http://www.ajkerkagoj.com/

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা

মধ্যগাঙে

জ্যৈষ্ঠপোড়া দিবাস্বপ্নে শুরু তবে আষাঢ়িয়া গপপো;
নোঙর কাছিও দড়িদড়া পড়ে রইল পারঘাটে,
পানসিবিবি একা-একা পা বাড়ান গুহ্যঅভিসারে
পরপারে; সহসা বিষম তোড়, কড়কড় ডাকে বাজ,

খলবল জলস্রোত, ধুন্ধুমার ঢল বেশুমার,
লুব্ধ দাঁতে কামড়ে ছেঁড়ে দাঁড় ও গলুই, পাটাতন;
কতদূর যাবি, চিনি তোর ছমছলাকলা, বেলাজ, কাব্যিক!

কেউ যেন বলেছিল, বেজাত কল্পনা, ভেসে-পড়া,
এতটা রঙ্গ তো ভালো নয়!

স্কিমিয়া

সারাক্ষণ তুই বুকে থাকিস, এ-কথা
বলতেই, পাঁজরের বামপাশে চিনচিনে ব্যথা;
বলে উঠি, ছেড়ে দে মা কেঁদে মরি

বহুদিন থেকে খুব সাবধানে আছি!

আদিগন্ত

ওরা ধেই ধেই করে নেমে এল
ভেঙে মাঠ, মাড়িয়ে ধানের চারা
তিষিক্ষেত; ওরা স্রোত, জল,
নদীতে ভাটার টান, জোয়ারের খলবল;

বিরল উৎসবে মেতে ওঠে
ধুলো, বালু, কাদা; আল-বেয়ে
কচিকচি ভুঁইচাঁপা, দূর্বা, তৃণ,
ঘুম-ভেঙে, চোখ কচলিয়ে উঠে বসে;

সাপের ফণায় চিক-চিকে আলো,
তাই দেখে, হা-হা হো-হো উড়াল হাসিতে

http://www.ajkerkagoj.com/

ফেটে পড়ে একঝাঁক কাদাখোঁচা,
পুষ্পের ফোয়ারা ছোটে স্রোতগ বিথারে;

ওরা শুধু শব্দ ওরা শুধু স্বর,
গৃহহারা বালকের বালিকার ভেজা ছায়া
ছুটে চলে গ্রহান্তর, কিলবিল পায়ে-পায়ে
খাবি খায় প্রাকৃতিক মাদল-আওয়াজ, পরিত্রাহি;

সেই ডাকে খাল-বিল-নালা ছেড়ে উঠে এল মাছ,
তড়িৎ বিস্ময়ে দেখে, তুমুল মুখর
রোদ্দুরের চোখমুখ ছেয়ে ধেয়ে আসছে

চরাচরে মৃতবৎসা শকুনীর ঘনঘোরপাখ!

উদ্বন্ধনে

আচানক জেগে উঠে বসি;
সে কি শুধু, পদশব্দ শুনব বলে, তাই!

এ-ভাবে বলো না লক্ষ্মী; এক পৃথিবীর ভার নিয়ে
দেখ, তোমাতেই ঝুলে-পড়ে আছি!

যাত্রা

যুদ্ধ, যুদ্ধ, বাজ পড়ছে চতুর্দিকে
অন্তরীক্ষে প্লাবন, প্লাবন,

কেউ আর একা নয় সমূহ মুহূর্তে;

শূন্য, শূন্য, পুড়ে-যাওয়া ছাই,
হাহাকার তুলছে ভস্মমাখা বাড়িঘর,

সহবাস শুরু তবে পরম নির্ভয়ে;

পায়ে-পায়ে কাদা বালু ধোঁয়া,
দীর্ঘ সারি প্রলয়ের মুখোমুখি,

http://www.ajkerkagoj.com/

সঙ্গী হাড়-গোড় বন্ধুব্যাঙ-ব্যাঙাচির;

ছেঁড়া-হাত ধরে আছে দাঁড়,
খুলে-পড়া চোখ দেয় দিক-নির্দেশনা,

ডিঙি নাও জ্বলে-ওঠে জ্বলন্ত সায়রে;

বাতিঘর, এক-একটি বিস্ফোরণ,
বন্দরের চুড়ো, আগুন আগুন

ওই শোন, কণ্ঠ ছিঁড়ে ডেকে উঠল মানুষ মানুষ!

অনৈতিহাসিক

বহুকাল কাদা বালু ধুলো হয়ে আছি।
এক খণ্ড হাত, উপড়ে-তোলা দুটো চোখ, নাভির দু'পাশে
ফুটো হয়ে খসে-পড়া মাংসপিণ্ড...
গড়িয়ে-গড়িয়ে নামে খাদ, তীক্ষ্ণ উপলে-পাথরে,
কম করে দু'হাজার ফুট,
খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে পার হয় বালুঝড়;
চি-চিৎকারে কেঁদে ওঠে, দাও, জল দাও, দাও লাকড়ি, কাঠ,
আগুন জ্বালাতে হবে ঘরে-ঘরে, খাদ্য, রুটি, নাতিউষ্ণ ভাত;
ততোক্ষণে কণ্ঠনালী পাকস্থলী চাকুর আগায়,
কিংবা কামানের নল ছেড়ে এক চিলতে ধোঁয়া ছুটছে
দিগন্ত পেরিয়ে পরিত্রাহি,
সেও খুঁজছে অসীম আকাশ ছুঁড়ে চিম্বুকের মাথা, ফোরাতের হাড়...

শুরু কবরের ইট-সুরকি সরিয়ে-সরিয়ে
শ্মশানের ছাইভস্ম ঠেলে উঠে-আসা,

উলটো-যাত্রা, গৃহান্তর!

http://www.ajkerkagoj.com/

এ সপ্তাহের গল্প

দাঁত

তুহিন সমদ্দার

ঝিকাতলায় নিচতলায় অর্চিকে নিয়ে শুভময় আর চিত্রাসেনীর সাজানো সংসার ঠিক ছবির মতো না হলেও তেরঙা ওয়াটার কালারের স্বচ্ছতায় মুগ্ধ! চিত্রাসেনী– যাকে শুভময় আদরে আবিষ্ট হয়ে ডাকে 'চি' আর খেপানোর ইচ্ছা হলে 'নি' কিন্তু দুয়ের আধিক্য যখন প্রবল হয় তখন রাত হলে নগ্নতায়, ডাকে 'চিনি'! শুভময়কে চিত্রা কিছু ডাকে টাকে না। তার এসব আবেগ টাবেগ আসে না। ভেতরে থাকে। কখনো কখনো সেই আবেগের চোরকুঠুরীতে শুভময় টোকা দিতে পারে– তবে তা দুর্লভ। শুভময় দেখেছে– প্রেম দিয়ে– অর্থ দিয়ে– সেক্স দিয়ে– কিছুতেই চাইলেই সে ঝনাৎ করে রূপোর কৌটার গুপ্ত কোঠা খুলতে পারে না। আবার কখনো কখনো বেহিসাবী চিত্রা সখের বাগান গোলাপফুল হাটখোলা করে অকাতরে বিলিয়ে দেয় সেই রত্ন। এ জন্যেই সাত বছরের বিয়ে তাদের এখনো রহস্যময় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, বিজাতীয় রহস্য নিয়ে মাঝে মাঝে ডাকে। সেই ডাক এমনই– তার সতর্ক সংকেত আগাম টের পায় শুভময়। কিন্তু অর্চির কারণে সব সময় হয়ে ওঠে না। দুধ উথলে গাঢ় সর পরার মতো দেহ যখন এমনকি কণ্ঠস্বরেও যৌনগন্ধের ভিয়েনে মাখামাখি হয়ে যায়– বিছানাটা তখন সত্যি উপভোগ্য হয়ে ওঠে তাদের।

এ বাড়িটায় তারা আছে তিন বছর ধরে। প্রথম বছরটা ভয়ে, দ্বিতীয় বছরটা সয়ে আর তৃতীয় বছরটা অভ্যাসে কাটিয়ে দিয়েছে তারা। চিত্রাসেনী এখন দুঃসাহসী নারী। কেবল হাফ টাওয়েল পেঁচিয়ে বাথরুম থেকে বেড়িয়ে সে বেডরুমে আয়নার সামনে চলে আসে। লম্বা প্রতিবিম্বে তার লম্বা সুগঠিত পায়ের লম্বচ্ছেদ– পেপার থেকে শুভময়ের দৃষ্টি ডাকাতি করে নিয়ে যায়। পেছন পেছন ততোধিক সাজুয্যপূর্ণ হাফ টাওয়েল জড়িয়ে নেংটি ইঁদুরের মতো নাক জাগায় অর্চি। শুভময়কে একদম উপেক্ষা করে গম্ভীরভাবে সে মায়ের একটা ব্রা নিয়ে মাথায় না গলায় না কোমরে পেঁচাবে– ঠিক ঠাহর করতে পারে না। দুম করে কিল দিয়ে অবশেষে বাপকেই নালিশ জানায় সে। সেই মামলার নিষ্পত্তিতে শুভময়ের আগ্রহ কোনো দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেয় না অবশ্য। চিত্রা বেশ কায়দা করে মেক্সিতে নিজেকে দূর সম্পর্কীয়া রমণীর মতো আন্তরিক করে তোলে। অর্চির হাসি তখন দেখার মতো। কাহিনীটা ঠিক ঠিক না বুঝলেও এটা যে সামাজিক সোশ্যাল এ্যাকশন ড্রামার মতোই কিছু একটা হবে, এটা সে বোধহয় ঠাহর করতে পারে। বেশ আগ্রহ আর পাদ্রীর গাম্ভীর্য নিয়ে মা বাবার মাঝখানে সরাৎ করে পড়ে প্রথমত বাবাকে প্রশ্ন করে "মামনি-আদর-করো?" হো হো হাসির হুররা বা আহ্লাদে আটখানা হবার আগেই মুখ ঝামটা দিয়ে চিত্রা জানিয়ে দেয় যে দিনদুপুরে এসব বেলেল-াপনা মেয়ের সামনে– তা ছুটির দিন হলেও– করা চলবে না। তারচে ইঁদুর মারা বিষ নিয়ে এসো!

– কেন বিষ খাবে কেন?

– খাবো না। খাওয়াবো। ঐ ইঁদুরগুলো আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

http://www.ajkerkagoj.com/

– চিত্রা, চিত্রা, চি-, তুমি কীভাবে নিশ্চিত, ওরা বহুবচন? একজনও তো হতে পারে।
– সে তুমি বুঝবে কী করে। তুমি কি খবর রাখো? আমি ওদের প্রত্যেকটাকে চিনি। অন্তত চারটা হবে। জমজ। মা-টাকে দেখছি না ইদানিং...
– যা ব্বাবা, ধেড়ে-মা- নেংটি, সব আছে বুঝি? কৈ, আমিতো কেবল একদিন দেখলাম– মুরগীর ডিমের চেয়েও ছোট একটা ইঁদুর ছানা–এক পলকে রান্নাঘর পার হলো।
– চোখ আছে তোমার যে দেখবে? বইপত্র কোথায় যে কী কেটে সাবাড় করছে ভগবান জানে। অথচ লাই দিয়ে দিয়ে কেন যে মাথায় তোলো।
– আচ্ছা, অত্তো ছোট একটা প্রাণীকে মারতে তোমার খারাপ লাগবে না? আমার তো কেবল মামনির কথা মনে হয়।
– নেংটি ইঁদুরের সাথে নিজের মেয়ের তুলনা করছো...
– কেন নয় চি–? অতো ছোট্ট একটা প্রাণী আর কী-ইবা ক্ষতি করতে পারবে আমাদের?
– বাড়িতে বাচ্চা আছে, কিসে কী মুখ দেয়– শেষে মামনির একটা অসুখ হবে– তবু তুমি গো ছাড়বে না।
– ঠিক আছে মারবো ওদের। কিন্তু বিষটোপ নয়, ফাঁদ পেতে।
– যা হোক একটা কিছু করো।
কিন্তু সকল কাজ মনে করে করলেও শুভময়ের কেন যেন ইঁদুর নিধন অভিযানে দেরি হয়ে যায়। অফিসের গাড়ির হুইসেল শোনার তরাসে ভোরবেলা টাই-জুতো-নাস্তার সুরাহা একত্রে করতে করতে মাঝে মাঝেই সে চিত্রার ইঁদুর কেন্দ্রিক সুপারিশে 'হু' দেয়। যথারীতি অফিস ফিরতি ক্লান্তির অজুহাত তৈরি করে অর্চিকে নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। পাঁচ বছরে পড়বে সামনের অগাস্টে। উপরের পাটির একটা দাঁত পোকায় ধরতে গিয়েও পারেনি বলে হাসলে দারুণ দেখায় বাচ্চাটাকে। মায়ের গড়ন পাবে মনে হচ্ছে। গরমের কারণে টাকু করে দেয়া হয়েছে সম্প্রতি। আরও নেংটি নেংটি লাগছে সে জন্যে। তবু সারাদিনে দশবার চুল বাঁধা, মাথায় টাওয়েল জড়িয়ে চুল শুকানো চাই তার। বস্তুত মাকে অনুকরণ করে করে সে অনেক পাকা কথা শিখে গেছে। সব্জিওলাদের সাথে নিখাদ সখ্যতায় ভারী গিন্নিবান্নি করে মাঝে মাঝে। মায়ের সাথে সাথে সেও দরদাম করে– তমেতো দস তাকা! কিন্তু সব ছাড়িয়ে তার যেটা বায়না– তা বই নিয়ে। বাসায় ফিরে হাতমুখ ধোয়ার আগেই বাবাকে পড়ে শোনাতে হবে বই। একাধিক বই জোগার করে ফেলেছে সে ইতোমধ্যে। বাবাকে শুধু পড়ে শোনালেই হবে না; গল্পের চরিত্রগুলো বিভিন্ন স্বরগ্রামে অভিনয় করেও দেখাতে হবে শুভময়কে। মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে বিরক্তি এসে যায়। কিন্তু সারাদিন একা একা একটা ছোট্ট শিশু বাবাকে খুব মিস করে? পড়ার ফাঁকে তুষার কন্যা যখন জল-দের কবলে, তখন অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠে অর্চি বলে– "বাবা দাঁত!" শুভময় দেখে, কাঁদো কাঁদো অর্চির হা করা মুখের ভেতর গোটা বিশেক দাঁতের মধ্য থেকে একটা বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। নড়ছে একটু একটু। "আমাদের সুন্তবুড়িটা তাহলে বড় হয়ে গেলো, তাই নাগো? বলে চিত্রা কেন যে এতো আনন্দিত হয়ে ওঠে বোঝে না শুভময়। এই মেয়েকে একদিন পরের ঘরে দিতে হবে– বাবার গলা জড়িয়ে

http://www.ajkerkagoj.com/

সুর করে বলবে না আর–আমার বাবা ভা-লো! শুভময় ভাবতে পারে না। অর্চি ভীষণ উত্তেজনায় ফুঁসতে থাকে। দাঁতের ভুত-ভবিষ্যৎ-উপযোগিতা– ইত্যাদিতে কান ঝালাপালা একদম। কেবল উপড়ানো দাঁত ইঁদুরের গর্তে ফেলতে হবে শুনে চোখ গোল গোল হয়ে যায় বাচ্চাটার। সে বুঝি কল্পনায় দেখতে পায় ইঁদুর তার দাঁত নিয়ে মহাসুখে কুচ কুচ করে সব কিছু কেটে সাফ করছে। – বাবা দাঁত কি পড়ে যাবে আমাল? তাহলে আমি কাতবো কী দিয়ে বাবা?

শুভময় হেসে ওঠে। চিত্রাও। 'তুই কি ইঁদুর নাকি, যে কাটবি?' পরক্ষণে মনে পড়ে যাওয়ায় আবার শুভময়কে ইঁদুর বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে হয়। কোথায় কী কেটে শেষ করছে কে জানে। কিন্তু এ বাড়িতে এখনো তেমন কিছু ধ্বংসযজ্ঞ চোখে পড়েনি, যা ইঁদুর সম্ভবে। কেবল খোলা পড়ে থাকলে এক টুকরো নারকোল, কিংবা একটি আলুর কিয়দংশে তাদের দংশনচিহ্ন পড়ে। চিত্রা তাতেই ক্ষেপে ওঠে যেন। আর আশ্চর্য–যমজ হলেও– ওদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে শনাক্ত করতে পারে সে। সেদিন অর্চি "মা ইদুল, ইদুল" বলে চেঁচিয়ে উঠলে চকিতে ফিরে তাকাতে তাকাতে ক্ষুদ্র প্রাণীটি পগার পার। কেবল এক টুকরো লেজের আবছায়া টেবিলের কোণায় চোখে পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে যায়, আর তাতেই চিত্রাসেনী খেঁকিয়ে ওঠে– 'দেখলেতো কী বেহায়া হয়েছে ইঁদুরগুলো?' তার দু'দিন পরে হঠাৎ করে যখন তার পায়ের নিচেই নরম নরম একটি প্রাণীবস্তু চ্যাপ্টা হতে না হতে কেমন ফিচেল তরাশে রান্নাঘরে দৌড়ে পালায় তখন চিত্রা বাস্তবিকই ক্ষেপে যায়। সে আলটিমেটাম দিয়ে দেয় শুভময়কে। অগত্যা শুভময় ইঁদুর ধরার কল কিনে আনে। অর্চি চেঁচায়– "বাবা আমল ইদুল ধলে কী কলবো বাবা?"

– খাবো। তোর মা রাধবে লংকা পেঁয়াজ দিয়ে ইঁদুরের স্যুপ!

– চুপ করো। মেয়েকে অসভ্যতা শেখাবে না।

শুভময় শুঁটকী মাছের টোপ বাঁধতে বাঁধতে একঝলক তাকায় স্ত্রীর দিকে। "তুমি সত্যিই হার্টলেস নি। একটা কচি জন্তুকে মারতে তোমার কষ্ট হয় না? আমারতো কেবল অর্চির কথা মনে পড়ে। ভাবতে পারো এই ফাঁদে আটকা পড়লে নিমেষে ওটা দু'টুকরো হয়ে যাবে?"

প্রথম দিন রান্নাঘরে র‍্যাকের নিচে পাতা হয় ট্র্যাপটা। কখন শুনবে খটাং করে ধাতব কাচিটা আটকে যাবার শব্দ– সেই জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে শুভময়। চিত্রা খুবই নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে পাশে। এমনকি তাকে পাশ ঘেঁষার ইঙ্গিতও দেয় আবছা। কিন্তু শুভময় কেবল অপেক্ষা করে এই বুঝি চিঁচিঁ আর্তচিৎকার আর যান্ত্রিক দাঁতগুলো সপাটে আটকে গিয়ে দু'টুকরো করে ফেলবে একরত্তি তুলোর গুলিটাকে! দুবার উঠে পানি খাবার উছিলায় দেখে আসে মৃত্যুকলটা কীভাবে মুখব্যাদান করে খাপ পেতে বসে আছে র‍্যাকের নিচে। মাঝখানে শুঁটকী মাছের টোপটা এতোই লোভনীয় যে ইঁদুর নয়, শুভময়ের নিজেরই খেতে গিয়ে ফাঁদে আটকে যেতে ইচ্ছে করে। জীবনে কতো ফাঁদইতো পাতা রয়েছে চারদিকে– এমন একটি দার্শনিকতা তার ভেতরে ভাবালুতা উসকে দেয়। তারপর নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ইঁদুরভাইদের উদ্দেশ্যে বিরবির করে বলে– তোরা ম্যাডামকে এতো যন্ত্রণা না দিলে

http://www.ajkerkagoj.com/

তো নজরে পড়তিস না। হাবা কোথাকার। কী দরকার ছিল ম্যাডামের পায়ের নিচে হাডুডু খেলার। দেখিস না সেন্স অব হিউমার একটু কম আছে। কার্টুন ছবি পছন্দ করে না। কতো সমঝে-বাঁচিয়ে সংসার করছি তা জানিস?

কিন্তু শুভময়কে কলা দেখিয়ে পরদিন ভোরে কলটা যেমন ছিল তেমন পড়ে থাকে। মাঝখান থেকে শুঁটকী মাছটা গায়েব হয়ে যায়। অতি সন্তর্পণে পুনরায় টোপ পাল্টাতে গিয়েও আর একটু হলে নিজের কড়ে আঙ্গুলটা খোয়াতে বসেছিল শুভময়। কেবল খানিকটা রক্ত আর চামড়া দিয়ে দায় সারতে হয়েছে এ যাত্রা। ফলাফল, ইঁদুর কলের এখানেই ইতি আর স্ত্রীর কাছ থেকে 'আনাড়ি' উপাধি। ত্রিশ টাকার লাগসই যন্ত্রটা ডিসএ্যাকটিভ করে চিত্রাই পরদিন ময়লার বিটিকে দান করে দেয়। দান মানুষকে মহান করে! কিন্তু শুভময়ের গো-বিষ দিয়ে সে কিছুতেই ইঁদুর মারবে না। তাছাড়া সেটা বেশ রিস্কিও। সে শুনেছে– বিষ খাওয়ার পর ইঁদুর নাকি দিগ্বিদিক হারিয়ে যা পায় তাতেই মুখ ডুবিয়ে দেয়। ঐসব কোনোভাবে যদি অর্চির খাবারে গিয়ে মেশে...!

এই ঘটনার পর থেকে চিত্রাসেনী আর ইঁদুর সংক্রান্ত কোনো সংবাদ শুভময়কে জানায় না। তবুও একদিন ছুটির দিনে অর্চির সেদিন একশো তিন জ্বর বলে অফিস কামাই দিতে হয়েছে শুভময়কে। সারাদিন কোল থেকে নামেনি মেয়ে। অসুখ বিসুখে বড্ড ব্যাপন্যাওটা সে। বাবার কাঁধ থেকে মাথা তুলে খানিক পর পর বলে– বাবা ব্যথা করে। কোথায় ব্যথা করে– তার উত্তরে দেখিয়ে দেয় দাঁত। শুভময় দেখেছে– দাঁতটা এখনো তেমন নড়বড়ে হয়নি। ওর অসুখ শুনে বাড়িয়ালী আন্টি বলছিলেন, দাঁত ওঠা আর পড়ার সময় বাচ্চাদের নাকি অসুখ বিসুখ হয়। দু'দিনেই সেরে যায় আবার।

কিন্তু জ্বরটা বাগ মানছে না। বরফ দেবার পরেও তাপমাত্রা নড়ছে না সেই সন্ধ্যাতেও। রাতে হঠাৎ করে কেন কে জানে শুভময়ের কাঁধের ওপর থেকেই বমি করলো অর্চি। কেবল জল বেরুলো কতগুলো। সারাদিন কিছুইতো মুখে তোলেনি। তারপর ওই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লো। তাকে সন্তর্পণে বিছানায় শুইয়ে মাথায় জলপট্টি দিতে লাগলো চিত্রা। রাত দু'টোর সময় শুষ্ক উত্তপ্ত কপাল আর ম্লান ঠোঁট বাঁকিয়ে হঠাৎই জেগে ওঠে অর্চি।

– বাবা খাবো আমি বাবা। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মতো বলে ফিসফিস করে।

– কী খাবে বাবা?

– তুপ খাবো বাবা। চিত্রাসেনী চমকে ওঠে– বাসায় কি স্যুপের সব উপকরণ আছে, না ফুরিয়ে গেছে? সে ভাবতে ভাবতে বিছানা ছাড়ে। তারই ফাঁকে অর্চি বলে–

– ইঁদুলের তুপ খাবো বাবা! চিত্রা লাইট জ্বালিয়ে পাকঘরে যায়। পরক্ষণে রান্নাঘর থেকে তার আচমকা চিৎকারে তড়াক করে উঠে বসে শুভময়– কী হলো!

ময়লা ঝুড়িতে কী যেন একটা! – বলে সেই ভয় আর কাঁপুনি আর নির্ঘুম ঘুমের ঘোরে শক্ত ঝাড়ুর দাঁড়াটি দিয়ে উপদ্রুত এলাকায় সপাটে আঘাত করলে পলায়নপর ক্ষুদ্র প্রাণীটির চিঁ চিঁ আর্তচিৎকার বড় ব্যথা হয়ে বাজে শুভময়ের।

– মেরে ফেললে নাকি?

http://www.ajkerkagoj.com/

– মারতে পারলাম কৈ? হারামিটা আমাকে জ্বালিয়ে খেলো একেবারে। – বলে অসুস্থ অভুক্ত কন্যার জন্য স্যুপ রাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে।
কিন্তু অর্চি খেলো না। এক চামচ মুখে তুলে বললো তিতা তিতা, খাবো না। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মেয়ের পাশে বসে রইলো রাত জেগে। শেষ রাতে জ্বরের মাত্রা একটু কমতে থাকায় অবশ চোখ দু'টো আর বশ মানছিল না বলে শুভময় স্বপ্নে দেখছিল– একটা দাঁত পলে গেছে, দাঁত... বলে অর্চির সেকী ভীত উল-াস! কে যেন তখন তাকে স্বপ্নে দাঁত নড়া অপমৃত্যুর লক্ষণ বলে সাপান্ত করে। কে, কে বলে এসব তাকে? কে কাঁদছে ফুঁপিয়ে এমন... ওহ্ চিত্রা তাহলে... কেন?... স্ত্রীর ধাক্কায় ধড়মড় করে ওঠে সে চেঁচায়–কী, কী হয়েছে মামনির? দেখে অবিশ্রান্ত জলের ধারা চোখে নিয়ে ফোলা চোখে চিত্রাসেনী হাপুস নয়নে ফোঁপাচ্ছে কেবল। ভোর হয়ে গেছে কখন। শূন্য বিছানায় শুধু তারা দু'জন, আর কেউ নেই।
অর্চি? মামনি কোথায়? কান্নার তোড়ে ভেজানো বাথরুমের দিকে ইশারা করে চিত্রা তবু কাঁদতেই থাকে। ক্বী ক্বী হয়েছে ওর? মামনির...? উত্তরে তাদের বিছানার পাশে মেঝেতে তাকায় একত্রে দু'জনই। তাকিয়ে দেখে; একটা দাঁতও পড়েনি। এখনো চকচক তীক্ষ্ণতা নিয়ে দুপাটি হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে, যেন সারারাত নির্ঘুম জ্বরে ও ক্লেশে বহুপথ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেবশিশু। নিশ্চুপ অভিযোগে ওদের ভেতরে কোথাও কোনো করুণা বা আর্তি জাগাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণীটি কোনো উন্নত জীবের বুদ্ধিমত্তায় ওদের পাশেই এসে শেষ নিদ্রায় শুয়ে আছে চোখ দু'টো খোলা! রেশমের মতো মৃদু রোম, দুইপাটি কচি দাঁত! শুভময় আর চিত্রাসেনী সেই থেকে বুকে তীক্ষ্ণ দাঁতের দংশন অনুভব করে করে চলে! অর্চি বড় হয়।

এসপ্তাহের কবিতা

জাহিদুল হক

গোধূলি, তুমি কি দেখেছিলে তাকে

দুস্থ স্মৃতির ওই বাড়িগুলো
কার? বলো, কার এই ভেজা দেশ?
বুলেভারে যার বাতাসেরা দ্বেষ
ছড়াচ্ছে শুধু আঁধারের ধুলো।

সরু গলি ধরে দু'পাশে বস্তি
যতোই এগুবে পাবে কিছু শ্বাস–
যাকে ছুঁয়ে ভারি হয়েছে বাতাস;
ভাঙে স্বপ্নরা, মুছেছে স্বস্তি।

http://www.ajkerkagoj.com/

বাড়িগুলো যেন খানা কী খন্দ
গুহা কী কবর হয়ে জেগে থাকে;
ওড়ে বাদুড়েরা; শকুনী ডানাকে
ঝাপটায়– ছেঁড়ে আকাশে ছন্দ।

তবু তারই মাঝে ভাসে নানা কথা,
মিছিলের ধ্বনি, শ্লোগানের স্বর;
দুস্থতা জয়ে বসায় আসর
উড়িয়ে পতাকা, ঢাকে কিছু ব্যথা।

আমার ব্যথা কি পড়ে তার মাঝে,
এই দুস্থতা, এই পতনের?
আমার জীবন ধস দিয়ে ঘেরা,
অসুস্থতারা বুকে বুকে বাজে।

ওষুধ-পথ্য শুশ্রূষা যতো
ততো বাড়ে রোগ, ততো কাতরায়;
জীবন হাসপাতালের পাড়ায়
খন্তারা বাজে যেহেতু সতত।

গোধূলি, তুমি কি দেখেছিলে তাকে
শহরে কোথাও– থিয়েটারে, পাবে?
ফিলহার্মোনি যখনই ছড়াবে
হ্যান্ডেল, বাখ– মধুর বিপাকে–
গোধূলি, দেখো তো, তাকে পাও কি না?
পেলে বলো তাকে, আমি ভালো নেই!
সেজানের মতো ‘এক শব’-এ সেই
সত্তা কি খুঁজি, সেই চির বীণা?

তুমি তাকে বলো, ছিটেফোঁটা তার
সুরভি যতোটা আজও দোলা দ্যায়,
এই নিঃশ্বাস ততোটাই পায়
দূরাগত ঘ্রাণ– সাগর অপার!

http://www.ajkerkagoj.com/

কতো আর তাকে সারারাত জুড়ে
ভুলে থাকা যায় এমন অটমে?
স্মৃতিগুলো খোলে বিস্মৃতি-খামে
জানালাকে– ঝরাপাতাদের সুরে!

শিহাব সরকার

টেবিলে গ্লাস উল্টে আছে

মেটেনি পুরো তৃষ্ণা
গ্লাস উল্টে আছে, পানি গড়িয়ে যায়
কে পেয়েছে দাম্পত্যের পরিপূর্ণ সুখ?
কবরের নাম ফলকে লেখা তরুণীর বয়স
সাতাশের নীচে। বুনো ঝোপে কবর ঢেকে গেছে
এ বয়সে চলে গেলো মেয়েটি?
অবুঝের মতো প্রশ্ন, বোকা প্রশ্ন, ক্লান্ত প্রশ্ন
ঐ যে গ্লাস উল্টে আছে
অর্ধেক পানি কিংবা মদ গড়িয়ে যায়
নিয়তি হাসছিল আড়ালে, কাবার্ডে সরু ক্রিস্টাল গ্লাস
রাস্তা থেকে আসছিল জয়ধ্বনি
গায়ের রঙে গোলাপি আভা ফুটেছিল প্রায়
হ্যান্ডব্যাগে প্লেনের টিকিট, রাত দশটায় উড়বে আকাশে
দ্বিতীয় হানিমুনে আমরা ক'জন গেছি দূর প্রবাল দ্বীপে?
সে পেরেছিল, খুব পেরেছিল।

সন্ধ্যাবেলা ফোন বাজছে
সেই সাথে আর্তচীৎকার প্রিয় বোনের বাড়ি, ই-মেইলে
কয়েক সেকেন্ডে দুনিয়ার এ-ধার থেকে ও-ধারে
একটি মৃত্যুর খবর বিজলী গতিতে ছুটে যায়
জয়ধ্বনি নেই, কান্না আছে
আগের লোবানের ঘ্রাণে মহাজীবনের আলো-অন্ধকার।
তখন প্লেন উড়ে গেছে, খোঁড়া হচ্ছে কবর
বেডরুমে বিলাপের শব্দ
বসার ঘরে, বারান্দায়, লনে এলোমেলো নিঃশব্দ জটলা
টেবিলে গ্লাস উল্টে আছে
পানি কিংবা মদ গড়িয়ে পড়ে ফ্লোরে।

http://www.ajkerkagoj.com/

সোহরাব পাশা

বর্ষা নামের মেয়েটি

জলের জানালা খোলে মেঘবাড়ি মেয়ে
কামিজে জড়ানো লাজুক মেঘের বৃষ্টি
রূপালি শরীরে কাঁপে জলের অক্ষর
উটকো বাতাসে নুয়ে পড়লেই থৈ থৈ
হঠাৎ কদম বর্ষা,
ফর্সা আকাশের তারাফুল ফোটে ঠোঁটে
আহা কী গভীর স্নিগ্ধ রোদ ওঠে চোখে
নিচে জ্বলে নক্ষত্র শিশির
টলটলে বর্ষার চিকন নদী, চাঁদ ভেঙে হাসে
মেঘের চশমা পরা মেয়ে।

মিতুল দত্ত

ভীষ্ম

লৌহশলাকা বিঁধছে তোমার পাঁজরে
শুয়ে আছো একা অবয়বহীন শূন্যে
মাথা ভেদ ক'রে গ্রহ-নীহারিকা ঘুরছে
যুদ্ধের শেষ রক্ত মুছছে গোধূলি

রক্তে রক্তে অনাদিকালে ঝগড়া
বাদী বা বিবাদী যে দলেই তুমি খেলেছ
তার মুখোমুখি ইচ্ছারুদ্ধ হিজড়ের
ব্যর্থ অঙ্গ বিঁধেছে তোমার শরীরে

শরীর বলতে যা বোঝ তুমি তা বাষ্প
হাওয়া মাটি জলে মিশে যাওয়া কিছু স্বপ্ন
স্বপ্নের শেষ দেখে যাবে তাই মরোনি
শলাকার মুখে বিঁধে আছো এক জন্ম

এক জন্মের হাজার মৃত্যু পাওনা
মৃত্যুর মুখে যে ঢালবে এক গণ্ডূষ
সে তো কবে তার পিতার ভীষণ শপথের

http://www.ajkerkagoj.com/

ধ্বজা বয়ে নিয়ে বসে আছে গূঢ় নিখিলে

তুমি তাকে কোনোদিন সম্ভব করোনি
সেই রাগে তার অভিশাপ ঝরে পড়ছে
তুমি যাই হও যতদূর হও ঈশ্বর
তোমার শরীর এ জন্মে মাটি পাবে না।

সমর চক্রবর্তী
জীবন প্রকল্প
উদয়াস্ত শরীর থেকে খসে পড়ে বুক
বাকলের মতো,
ফুটপাত থেকে উঠে আসে দুঃখিত আগুন
ঠোঁটে অবাধ তৃষ্ণার লালা ঝুলে থাকে দ্বিধায়
জলসেদ্ধ উনুন বিজ্ঞাপনে হাসে, তেঁতে-পুড়ে ছাই হলে প্রোপেন!
আমরা আর চাই না দরপত্রের নীলাম জীবন
আমরা আর চাই না হাসপাতালের মানবিক স্বাস্থ্য
আমরা জীবন চাই, জীবনের মতো
নীলাম-দরপত্রের হাঁক ডাকহীন!

মিজান খন্দকার
দেবী
কী প্রবোধে বাঁধি গ্রীষ্মচিত্র ভরা এই মন।
সহসা যখন মন থেকে দূরে
ছড়িয়ে পড়ে এ দৃষ্টি
বহুমাত্রিক বস্তু তাতেই হয় যে তরল।

ঐ তরল জাগানিয়া তীক্ষ্ণ মর্মবাণ বিঁধেছিল
একদিন রাধার বুকেও; অথচ যমুনা
যেদিন ব্যাকুল হয়েছিল উচ্চাঙ্গগীতির সুরে।

সেসব দিনের মোহে উঁচু উঁচু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
ছেলেরা আজও পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে;
আর ঘুরে ফিরে বেসুরে কেবল
বাঁশরী বাজায়।

http://www.ajkerkagoj.com/

তবু মুগ্ধ হয় না দেবীরা; তারা আপন মনে আকাশে
শুধু বৃষ্টি বাদল নিয়েই খেলা করে সারাক্ষণ।

দীর্ঘক্ষণেও শাপলা দিঘির কোমর জলে স্নান
সম্পন্ন হয় না বলে
পিসতুতো বোনেরা বিষণ্ন হয়ে পড়ে। ফলে
শরীর মার্জন ভুলে অযথা সকলে
আড়চোখে এ ওর বুকে মাতৃত্ব-সম্ভাবনা খোঁজে।

প্রবল বৃষ্টির খোঁজে তবে চল ভাই ডালে উঠে
ডানার ভঙ্গিমা ধরে
তারপর একসাথে ঝাঁক বেঁধে
উড়ে গিয়ে আকাশের মেঘ থেকে দেবী পেড়ে আনি।

জাকির জাফরান
পতন
ছাইগাছের পাতায় পাতায় আমার নগ্নতা প্রকাশিত আজ
পতন ঠেকাবে কে?
ক্ষতস্থানের সৌন্দর্যে দোলে ওঠে মন
এই তবে পৃথিবী
জোছনা দেখতে গিয়ে খাদে পড়ে গেছে পা
এই তবে পতন আমার।

এদেশে রাজনীতিকদের দিকদর্শন দেয় অবুঝেরা
সরদার ফজলুল করিম
সুবর্ণরেখায় ১২ জুন ২০০৩ চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে প্রাবন্ধিক রতনতনু ঘোষের যে আলাপচারিতা ছাপা হয়েছিল, তার পাঠান্তে পাঠক আতিক রহমানের এক চিঠির জবাবে সরদার ফজলুর করিম পুনরায় সুবর্ণরেখার জন্য অন্যরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যা সুবর্ণরেখায় ছাপা হয়। সে প্রতিক্রিয়া এবং সজল আশ্চার্য্য প্রতিক্রিয়া ছাপা হলে ১৭ জুলাই স্টালিন সুমনের প্রতিক্রিয়ায় পুনরায় সরদার ফজলুল করিম যে প্রতিক্রিয়া রতনতনু ঘোষকে দিয়েছেন, তা পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

রতনতনু ঘোষ:কেমন আছেন স্যার?

http://www.ajkerkagoj.com/

সরদার ফজলুল করিম:ক্ষয় নিয়ে বেঁচে আছি। শারীরিক ক্ষয় প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। বিগত দিনের তুলনায় আজ আরো বেশি ক্ষয় হচ্ছে।

রতনতনু ঘোষ:ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় থেকেও তো সমাজ নিয়ে ভাবেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাই আপনার কাছে। কিছু দিকনির্দেশও পেয়ে যাই।

সরদার ফজলুল করিম:আমি ছোট মানুষ। বেশি বড় কথা আমার মুখে মানায় না। নিজের সমস্যা-সংকট সবই মুখে বলতে পারি না। আমি সব প্রশ্নের জবাব দানের স্বয়ংক্রিয় মেশিন নই। বিপরীত প্রশ্ন করেই তুমি আমাকে নাড়িয়ে দাও। সে জন্য আমি কিছু না বলেও পারি না। আমার কথায় দিকনির্দেশ থাকে বলে মনে করি না। আমার দিকনির্দেশ অন্যে মানবে কেন? আমার কথায় দিকনির্দেশের অভাব নেই। যার যা করার ইচ্ছে হয় সে তা করছে। কারো দিকনির্দেশের অপেক্ষায় কেউ বসে নেই। কারো দিকনির্দেশ কেউ মানে না। প্রত্যেকের নিজস্ব দিকদর্শন গড়ে ওঠে। একের ব্যর্থতা ত্রুটি নিয়ে অন্যের পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

রতনতনু ঘোষ:অনেকের পরিপূর্ণ জীবনবোধ নেই। প্রকৃত জীবনবোধ ছাড়া সঠিক দিকদর্শন গড়ে উঠতে পারে না। মানুষ চায় সহজে সব যেন পাওয়া যায়। সে নিজে আশা করে আবার আশা ভঙ্গের বেদনাও বোধ করে।

সরদার ফজলুল করিম:স্টাডি করে জীবনের স্কেচ তৈরি করা যায়। এখন অনেকে সহজেই সবকিছু বাজিমাৎ করতে চায়। জীবনকে অতো সহজে অভিজ্ঞতায় আনা যায় না, জয় করা যায় না। এর জন্য বহু পরিশ্রম, বহু প্রচেষ্টা, বহু অন্বেষার প্রয়োজন। জীবনকে জানতে হবে সবদিক থেকে। রিকশাওয়ালার কাছেও আমাদের প্রয়োজন আছে। যাদের মাধ্যমে প্রয়োজন মিটে তারা জীবনের জন্য অপরিহার্য। তাদেরকে বাদ দিয়ে সার্বিকভাবে জীবন স্টাডি করা যায় না। সহজে যা পাওয়া যায় তা কাজে আসে না। অর্জন করে পাওয়ার মূল্যই আলাদা। সহজে যার কাছ থেকে পাওয়া যায় তার কাছ থেকে তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। তা দিয়ে বেশিকিছু হয় না। যার কাছ থেকে যা আশা করা হয় তার কাছ থেকে তা পাওয়া যায় না। আবার যার কাছ থেকে যা আশা করা হয় না তার কাছ থেকে তাও পাওয়া যায়।

রতনতনু ঘোষ: দেশের মানুষ পাওয়া, না-পাওয়া নিয়েই বেঁচে আছে। আরো ভালোভাবে বাঁচার জন্য, নিরাপদ জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে।

সরদার ফজলুল করিম:বাংলাদেশে যে বেঁচে থাকতে চায় সে হলো বোকা। বহু লোক অভাবে মারা যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে পারছে না। ভালোভাবে বেঁচে থাকার ভরসা থাকলে মানুষ অস্বাভাবিকভাবে মরতো না। প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে আর মানুষ মরছে। জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। মানুষের সামনে মানুষ মারা হচ্ছে ইচ্ছে করে, হিংস্র নির্যাতনে। মেরেই হত্যাকারীরা পালাচ্ছে সতর্কভাবে। এটিতো দুর্ঘটনা নয়, হত্যা। এখন বাংলাদেশে বেঁচে থাকাটাই একটা অপরাধ। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত। অন্যের চিন্তা অন্য রকম হতে পারে। কারো সঙ্গে আমার এ অভিমত নিয়ে চ্যালেঞ্জও করছি না।

http://www.ajkerkagoj.com/

রতনতনু ঘোষ: বেঁচে থাকাটাই যদি অপরাধ হয় তাহলে তো সেই অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার কথা। আপনি কি মনে করেন শাস্তি ভোগ করছেন?

সরদার ফজলুল করিম: এ রাষ্ট্রে বেঁচে থাকাটা অপরাধ বলেই শাস্তি পাচ্ছি নানাভাবে। আত্মহত্যা করতে পারি না বলে বেঁচেও থাকছি এক রকম। আমার ছেলে-মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। তাদের প্রতি আমার টানও আছে। বর্বর পরিবেশের অসহায় শিকারে পরিণত হওয়াটাই মানুষের জীবনের বড় যন্ত্রণা। রাষ্ট্র যখন বাঁচার পরিবেশ দিতে পারে না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে না, বিকাশের সুযোগ দিতে পারে না তখন পরিবেশের বর্বরতাও বাড়ে।

রতনতন ঘোষ: সরকার বলছে দেশে নিরাপত্তা আছে, সুশাসন আছে। সরকারি ভাষ্যমতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি সত্ত্বেও আপনি মানসিক মৃত্যুর যন্ত্রণার দগ্ধ কেন?

সরদার ফজলুল করিম: নিজেদের শাসনামলে সংঘঠিত খুন-ধর্ষণ, নির্যাতন-দখল, উচ্ছেদ বন্ধ করতে না পেরেও সেই পরিস্থিতিকে শাসকদলের কেউ সুশাসন বলে দাবি করলে সুশাসন কাকে বলবো!

রতনতনু ঘোষ: সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রয়োজন। সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে এসবের অভাব বজায় থাকলে শুধু কথা দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সরদার ফজলুল করিম: রাষ্ট্র ব্যবস্থায় থেকে ফাঁকি দিচ্ছে সকলেই, এড়িয়ে যাচ্ছে নিজস্ব দায়িত্ব। এ জন্য দুর্নীতি বাড়ছে, দুর্ঘটনাও বাড়ছে। প্রত্যেকের দায়িত্বের ফাঁকিকেই দুর্ঘটনা বলা যায়। গাড়ি চালক গাড়িকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলেই দুর্ঘটনা ঘটে। সেটিতো স্বাভাবিক ঘটনা। বিরূপ কোনো কিছু ঘটলেই আমরা তার নাম দেই দুর্ঘটনা। আসলে তা কোনো না কোনো ধরনের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতার ফল।

রতনতনু ঘোষ: রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল জনগণের জন্য। রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে সরকার জনগণের জন্যই কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার থেকে সরকারের বিচ্যুতি রাষ্ট্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, জনসেবাকে বিপন্ন করে।

সরদার ফজলুল করিম: এখানে রাষ্ট্রসভা সঠিকভাবে কাজ করছে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যে রাষ্ট্র সেটি তো দেখছি না। প্রাচীনকালের বিশ্বকোষ এরিস্টটলের রাষ্ট্র তো এটি নয়। দেশ-কাল নির্বিশেষে শাসকদের জন্য যে গুণ তিনি নির্দেশ করেছিলেন সেগুলোর অভাব আছে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে। আনুগত্যপরায়ণতা, দায়িত্বের যোগ্যতা ও সততা এসবের অভাব আছে বলেই ফাঁকি দিচ্ছে তারা।

রতনতনু ঘোষ: আপনি রাষ্ট্রদর্শনের শিক্ষক। সমাজতান্ত্রিক বিপ-ব আনায়নের জন্যও কাজ করেছেন। রাজনীতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

সরদার ফজলুল করিম: রাজনীতি নিয়ে আমি আর কী বলবো? এ ব্যাপারে বলার আছেন অনেকে। যাদের জন্য রাজনীতি তাদের মতামত জানো। রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মূল্যায়নও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এসব রেডিমেড অবস্থায় পাবে না। সাধারণ লোকের কাছে

http://www.ajkerkagoj.com/

যেয়ে একটু সময় ব্যয় করে চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই বিভিন্ন মত পেয়ে যাবে। তারা কেউ কিছু জানে না একথা বলা যাবে না। প্রত্যেকে বহু বিষয়ে কিছু না কিছু জানে। না জানলে প্রশ্ন করে কীভাবে? সেই জানাকে ভালোভাবে জানতে হবে। আমি কোনো বিষয়ে মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেই না। আমার কোনো চিন্তাও অন্যের জন্য সাধারণীকরণ করতে চাই না। যে যা বোঝে সে অনুযায়ী তাকে বলতে দিতে হবে। এটিই মত প্রকাশের স্বাধীনতা। মোজাফফর আহমদের নিকট যেমন যাওয়া প্রয়োজন তেমনি রিকশাওয়ালার কাছে যাওয়াও প্রয়োজন।

রতনতনু ঘোষ: দৈনিক পত্রিকাগুলোতে রাজনীতির হালচাল নিয়ে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষের মনোভাব, রাজনৈতিক ঘটনাদির বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়াও ছাপা হয়।

সরদার ফজলুল করিম:দৈনিক তো একটা মনোহারি দোকানের মতো। তাতে সব থাকে, থাকতে হয়। যার যা দরকার এর থেকে নিয়ে নেয়। সবাই সবকিছু নেয় না। এখানে কথ্য আছে, তত্ত্ব আছে আবার বিনোদনও আছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণে সত্যিকার কারখানা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। উন্নতমানের জিনিস পরিবেশন করে বাণিজ্যিক লাভের দিকে তাদের তৎপরতা আছে। এতে দোষারোপের কিছু নেই।

রতনতনু ঘোষ: রাজনীতিকদের প্রতি জনগণের খুব ভালো মনোভাব নেই। নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কাছে যাওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর নির্বাচিত হয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করা তাদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। রাজনীতিকরা কীভাবে গণসম্পৃক্ত হয়ে গণমঙ্গল করতে পারে সে ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ লোক হিসেবে আপনি দিকদর্শন দিতে পারেন।

সরদার ফজলুল করিম:রাজনীতিকরা কারো দিকনির্দেশে চলে না। তারা নিজের প্রয়োজনে, নিজের দিকনির্দেশে চলে। জনগণের ভালো কীভাবে করা যায় তা তারা জানে কিন্তু মানে না। যে যার মতো চিন্তা করুক, নিজের দিকনির্দেশক নিজে হোক। তাতে আমার আপত্তির কিছু নেই। রাজনীতির দিকনির্দেশ রাজনীতির অভিধানে আছে, জনগণের মধ্যেও আছে। এদেশে রাজনীতিকদের দিকদর্শন দেয় অবুঝেরা। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই দেখবে জনগণকে যা বলতে নেই রাজনীতিকরা তাও বলে। জনগণ যা শোনতে চায় না তারা তাও শোনায়। যা জনগণের পক্ষে নয় তারা তাও করে নিজ স্বার্থে। যে নেতা দিকভ্রান্ত সে জনগনের দিকদর্শন হতে পারে না। জনগণ সচেতন হোক, দিকদর্শন বুঝে নিক।

রতনতনু ঘোষ: রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। রাজনীতিকরা একটি সুস্থ ধারায় থেকে, লোভমুক্ত হয়ে কাজ করলে জনগণ আরও উপকৃত হতো।

সরদার ফজলুল করিম:রাজনীতিকরা তো লোভ-মোহের উর্ধ্বে নয়। তারাও মানুষ। তাদের পরিবার আছে, বাড়ি-গাড়ি আছে, ব্যাংক একাউন্ট আছে। সব ভালোই তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এদেশে প্রত্যেকে আছে নিজেকে নিয়ে। অপরের জন্য কেউ ব্যস্ত নেই। যে অপরকে নিয়ে ব্যস্ত সেও নিজের জন্যই অপরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

http://www.alkerkagoj.com/

পাঠ প্রতিক্রিয়া

হায় সুভাষ!

বিংশ শতাব্দির ৭-৮ দশকে আমাদের মনে হতো কাব্যপিপাসু প্রগতিশীল বিপ-ব আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমার্থক। পদাতিকের কবি একে একে লিখছেন– পাগল বাবরালীর চোখের মতো আকাশ, ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত, রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক, কিংবা প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিল বিপ-বী ভাবনার অপরিহার্য কবি। তার বিপ-বী কবিতায় ছিল যাদুকরী ছন্দ– স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তে তিনি ছিলেন নিমগ্ন। সেই মানুষটি মারা গেলেন ৮ জুলাই ২০০৩ তারিখে। স্বাভাবিকভাবেই তাকে নিয়ে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় কম লেখা হচ্ছে না। অনেকের লেখায় স্রেফ স্মৃতিকথা ছাড়া তেমন কিছু নয়। ব্যক্তি সুভাষকে ষোল আনা পাওয়া যায় কমই। এর ভিতর থেকে তিনটি আলোচনাকে আলাদাভাবে উলে-খ করতে হয়– কিন্নর রায়, মতিউর রহমান ও আল মাহমুদের লেখা। তিনজনের লেখাকে পরপর পড়তে থাকলে সুভাষ সম্পর্কে একটা সমকালীন ধারণা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সুবর্ণরেখায় লেখা কিন্নর রায়ের লেখাটিই অধিকতর ব্যতিক্রমী। তিনি যে সিপিআই ছেড়ে ক্রমান্বয়ে কংগ্রেস বেয়ে একেবারে মমতার তৃণমূল কংগ্রেসের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়েন তা কিন্নরের লেখা থেকেই স্পষ্ট জানা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য দান করা ডেডবডি নিয়ে মমতার ষণ্ডাপাণ্ডারা রীতিমতো মাস্তানি করে এবং লাশটি অবশেষে জবর-দখল করে দাহ করতে শ্মশানে নেয়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তার স্মৃতিকথায় জানালেন কবির এ যাত্রায় শ্মশানঘাটে তেমন লোকই ছিল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবশ্য বাংলাদেশের অনেককেই অবাক করে দিয়েছিলেন সেই এরশাদ আমলে– সরকারিভাবে আয়োজিত কবি সম্মেলনে যোগ দিতে এসে।

তারপরও এমন একজন জীবনবাদী কবিকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানানো উচিত।

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

প্রসঙ্গ : আহমদ ছফা

গত ৩ জুলাই আহমদ ছফাকে নিয়ে দুকলম লিখে আমি বোধ হয় চোরাবালিতে আটকে গেলাম। লেখার পিঠে লিখতে হয়। হাসান আল আবদুল-ার লেখাটি দেখে আমি অবাক হইনি, মর্মাহতও হইনি। এর কারণ একটু আভাস দেব মাত্র। এ লেখার প্রতি-উত্তরে কোনো কিছু লেখা আমি সমীচিন মনে করি না। যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এবং একজন প্রয়াত প্রখ্যাত সন্মানিত ব্যক্তিকে নিয়ে মিথ্যাচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে সেই বিধায় এর প্রমাণ করার দায়ীত্ব আমার উপর বর্তেছে। তাই দু' কলম, খুব সংক্ষেপে লেখা, শুধু দায়মুক্ত হবার জন্য। (সম্মানিত সম্পাদক, ছফা ভাইয়ের হাতের লেখা এই চিঠিতে পাঠালাম– পড়ে

http://www.ajkerkagoj.com/

দেখবেন।) না হয় এ ধরনের লেখার উত্তর দেয়া জঘন্য সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। পাঠক আমাকে মাফ করবেন।

আমি লিখেছিলাম অলম খোরশেদ সীমান্ত সংবাদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ছফা ভাইকে দিয়েছিল ১৯৯৫ সালে। হাসান সাহেব দাবি করেছেন তিনি বহন করে নিয়েছিলেন সেই পাণ্ডুলিপি। ডাক পিয়নের নামটা ছফা ভাই মিথ্যা লিখেছেন এবং আমিও। তিনি জানতেন না যে সীমান্ত সংবাদ নামটা আলমেরই দেয়া। সে নাম স্থির করে নিজে থেকে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যায় আলম খোরশেদ যা ছফা ভাই উদ্ধার করতে পারেননি বলে আর একটা কপি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আসলে হাসান সাহেব নিয়েছিলেন পরিশীলিত আর একটা কপি। তার প্রমাণ স্বরূপ ছফা ভাইর চিঠিখানি তুলে ধরলাম। পুরা চিঠিখানি তুলে ধরলাম না কারণ কেউ কেউ আরও রেগে যাবেন।

পাঠক লক্ষ করুন, ছফা ভাই লিখেছেন সাপ্তাহিক রোববারে দিয়েছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটা ফেরত পাননি। আর একটা কপি পেয়ে বুঝতে পারলেন কিছু ঘষা মাজা করা হয়েছে। এবং কপিটা হাসান নিজে পৌঁছে দেয়নি। পরবর্তি চিঠিতে আছে হাসান তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে দেখা করেছিল। সেই উপন্যাস নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কেন যে করেননি এটাই ছিল ছফা ভাইর অপরাধ।

কোনো লেখার উপর আলোচনা/সমালোচনা করার অধিকার সকলের আছে। হাসান সাহেবও সে অধিকার রাখেন। আমার লেখা হোক বা যে কোনো লেখা হোক। ব্যক্তিগতভাবে লেখককে আক্রমণ না করে লেখার সমালোচনা করার নিয়ম। তিনি আমাকে এবং ছফা ভাইকে মিথ্যার অপবাদে দায়ী করার আগে একবার অন্তত আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন। এতদিন তার ভেতর এত ক্ষোভ জমা ছিল জানতাম না। কোনোদিন প্রকাশ করেননি। আজ হঠাৎ বিষোদগারে ফেটে পড়লেন। নিজের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করার আগে একবার জানা দরকার ছিল আসল ঘটনা কী?

হাসান শুধু ছফা ভাইকেই নয়, আরও অনেক জনপ্রিয় লেখকদের নিয়ে কী সব মন্তব্য করে বেড়ায়, এমন কি লিখিতভাবে প্রকাশ করে তার কিছু প্রমাণ দিচ্ছি।

হাসানের সম্পাদনায় একটা কবিতাগুচ্ছ বের হয় নিউইয়র্ক থেকে। আমাকে একটা কপি পাঠিয়েছিলেন। তাতে তার সম্পাদকীয় দেখে আমি থমকে গেছি। সে লিখেছে, ".. তবে এখানে উচ্চারিত নামের বাইরে ঢাকা ও কলকাতার কেউ কেউ ইতিমধ্যে হাততালি কুড়িয়েছেন অনেক– দলভারি করার সুবাদে দৈনিকে 'গুচ্ছ কবিতা' সহ প্রভূত পিঠালোচনার সুযোগও পেয়েছেন। কিন্তু কবিতার খাতা অপরিশীলিত, অতিকথন, ছেঁড়াখোঁড়া বাক্যবিন্যাসে হয়ে উঠেছে বালকের বাচাল পঙক্তির আধার। অন্তত: যে দেশে তরুণ কবিদের পীর বনে যান সিকদার আমিনুল হক ও মোহাম্মদ রফিক, ..." এ দুজন কবির অপরাধ, তার কবিতার প্রশংসা করেননি। এ অপরাধে আরও যাঁরা অপরাধি তারা হলেন, কবি শামসুর রাহমান, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হক, সলিমুল-াহ খান, বদরুদ্দিন ওমর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, পুরবী দত্ত প্রমুখ যারা

http://www.ajkerkagoj.com/

আমাদের সাহিত্য আসরে এসেছেন এবং আড্ডায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রয়াত শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ব্যক্তি আব্দুল মালেক রাগ করে আসরে আর আসতেন না। বলতেন এই ইঁচড়ে পাকা বাচালটার জন্য আসরে আসব না। নিউইয়র্কে অনেকেই জানে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আসর শেষে খাওয়া দাওয়ার পর আমার বেক ইয়ার্ডে বসে তাঁর নিজের আনা বিড়ি টানতে টানতে দুঃখ করে বললেন, তোমাদের হাসানটা কি? সে আমাকে প্রেসার দিচ্ছিল তার কবিতা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করার জন্য। আমি তো তার কবিতায় তেমন কিছুই পাইনি। যাক, এমনি অনেক কিছু। ছফা ভাইকে নিয়ে সে যা লিখেছে তা থেকেই পাঠক অনুমান করতে পারেন। মানুষ বিখ্যাত হবার জন্য কত রকম ফাঁদ পাতে কে জানে! এসব লিখতে গিয়ে আমার নিজকে একজন অপরাধী সঙ্কীর্ণমনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কী করব। একজন মৃত ব্যক্তির নামে মিথ্যার মিথ্যা অপবাদ যারা আনতে পারে সে কত বড় মিথ্যুক তা পাঠক বিবেচনা করবেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের লেখার উত্তর দেবার কোনো প্রশ্নই আসে না।

হাসান দাবি করেছে তাকে আমি 'ছোডো ভাই' বলে ডাকতাম। ছোডো ভাইকে কানে কানে জিজ্ঞেস করি, ভাই তুমি শারীরিক, মানসিকভাবে ভালো আছ তো? কারণ আমার লেখাটা ছাপা হল ৩রা জুলাই, তুমি তার উত্তরে লিখলে ১৩ই জুন তারিখে। তাহলে কি তুমি আগেই জানতে আমি ছফা ভাইকে নিয়ে কী লিখব? নাকি অলৌকিক কিছু ভর করেছে তোমাকে?

পরিশেষে ছোডো ভাইকে আমার আদেশ, উত্থান পর্বের বিশ কপি তোমার কাছে আছে বলে লিখেছ, এবং আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একশ ডলার নিয়ে গেছি। সেই বিশ কপি অতি সত্ত্বর নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। প্রাপ্তির সাথে সাথেই তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

মোল-া বাহাউদ্দিন
৯০৭-৭ ক্রিসেন্ট পে-স
টরন্টো, অন্টারিও এম৪সি ৫এল৭

http://www.aljerkagoj.com/